মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক

মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : শঙ্কর ঘোষ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

"রা-স্বা"

শ্রীমতী আলো বসু

শ্রীসুনীল বসু

করকমলেষু

মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক

এক : আহাম্মকের জন্মবৃত্তান্ত ও পরমাণু বোমার প্রভাব

এ এক আহাম্মকের জীবনচরিত।

জন্মমাত্রই আহাম্মকটা বুঝতে পেরেছিল, জীবনটা খুব সুখের হবে না। কারণ সে যখন গেঁয়ো এক আঁতুড়ঘরের মাটির মেঝেয় চাটাইয়ের ওপর চিত হয়ে পড়ে থেকে তারস্বরে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করছিল তখন তার মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় চলছিল উঠোনে তুলসীতলায়। তার বাউণ্ডুলে বাপ তখন গাঁ থেকে অনেক দূরে এক জলসায় বাঁশিতে বেহাগ বাজাচ্ছে। আর আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরো ঘুটঘুট্টি করে এক মিশকালো মেঘ তৈরি হচ্ছিল সৃষ্টি ভাসিয়ে নিতে।

তার জন্মলগ্ন কেমন ছিল তা কে বলবে? তার জন্মপত্রিকায় গ্রহসংস্থান নিয়ে কেউই তখন বা পরবর্তীকালে মাথা ঘামায়নি। তবে গ্রহাণুকূল্য কিছু নিশ্চিত ছিল তার। নইলে বিক্রমপুরের সুখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের বিশ্রুত মল্লিক পরিবারের ছোটো তরফ জয়ধ্বজের কনিষ্ঠ পুত্রের দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করার স্পর্ধা তার কিছুতেই হত না।

বজ্রযোগিনী বিখ্যাত গ্রাম। অতীশ দীপঙ্কর এই গ্রামেরই লোক বলে কথিত আছে। তবে বিক্রমপুর ধনী জমিদারদের চারণভূমি নয়। অতিশয় বানভাসি দেশ বলে সেখানে কৃষিকর্মের ওপর মানুষের নির্ভরতা ছিল না। বর্ষা ঋতুতে এবং পরবর্তী কয়েক মাসেও লোকজনের নৌকো ছাড়া দ্বিতীয় পরিবহন ছিল অগোচর। ফলে বিক্রমপুরের লোককে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে এবং রুজি-রোজগারের জন্য প্রবাসবাসও ছিল তাদের অনিবার্য।

ছোটোতরফ জয়ধ্বজ মল্লিক স্বদেশিয়ানায় দীক্ষা নেওয়ার দরুন চাকরিকে বিষ্ঠাতুল্য মনে করতেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ভুষিমালের ব্যবসা করতে থাকেন এবং মোটামুটি ধনী বলে খ্যাতি লাভ করেন। ধন উপার্জন এক কথা

আর ধনের সদ্ব্যবহার আর এক কথা। দ্বিতীয় বিষয়ে জয়ধ্বজ খুব বিচক্ষণ ছিলেন না। তাঁর অর্জিত ধন তাঁরই তিন পুত্রের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তাটিকে আরো অবারিত করে দিচ্ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর এমনিতে ভালমানুষ এবং কিছুটা গোঁয়ার হলেও তাঁর এক কিম্ভূত বাতিক ছিল। তা হল হিপনোটিজম শিক্ষা। এর জন্য তিনি বহু ম্যাজিসিয়ান, তান্ত্রিক ও সাধুর কাছে তালিম নেন এবং তাদের মোটারকম দক্ষিণা দেন। হিপনোটিজম শিখতে তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়াতেন। শেষ অবধি বিলেত পর্যন্ত ধাওয়া করেন। কতদূর শিখেছিলেন বলা মুশকিল। তবে বাপের তবিলে একটা বড় রকম খাবলা তাঁর দিক থেকেই এসেছিল। দ্বিতীয় সর্বেশ্বর ছিলেন ধুরন্ধর প্রকৃতির। মেজো ছেলেরা ধুরন্ধর হয় বলে একটা কিংবদন্তীও আছে। বিক্রমপুরে "মাঝলা শয়তান" বলে একটা কথা প্রচলিতই ছিল। সর্বেশ্বর তার বাপের কারবার দেখত এবং যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করত। তৃতীয় বিশ্বেশ্বর অন্য কোনো গুণের আধার না হলেও সংগীত ও বিশেষ করে বাঁশি বাজিয়ে সে আমলেই খুব সুনাম পেয়েছিল। জয়ধ্বজের তিনটি পুত্রই শিক্ষিত। বাপের সঙ্গে তাদের বয়সের পার্থক্যও খুব বেশী ছিল না। জয়ধ্বজের বয়স যখন পঞ্চাশ তখন সিদ্ধেশ্বরের একত্রিশ, সর্বেশ্বরের ত্রিশ ও বিশ্বেশ্বরের ঊনত্রিশ। তিনজনেই বয়স্ক, দুজন বিবাহিত, মেজোজন সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন এবং সে ছাড়া অন্য দুজনেই উপার্জন বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা ও উদ্যোগহীন।

আমাদের আহাম্মকটির জন্মপত্রিকা কখনো তৈরি হয়নি। সুতরাং তার গ্রহাণুকূল্য বা গ্রহর বৈগুণ্য সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানার উপায় নেই। তার জন্মের কিছুক্ষণ পরেই এক প্রবল বৃষ্টিতে গোটা পরগণা এমনভাবে জলের তলায় চলে গেল যে মাস দুই আর ডাঙ্গা দেখাই গেল না। তার মায়ের দাহকার্য সেদিন তিন-চারবার ব্যাহত হয়। কিন্তু এখানেই অশুভ লক্ষণের শেষ নয়।

এখন জন্ম দিনটির কথাই বলা যাক। শোক-সন্তপ্ত পরিবার যখন আহাম্মকের মৃগীরোগী পিসিকে নবজাতকের পাহারায় রেখে নানা রকমভাবে বিলাপ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে শিশুটিকে শেয়ালে নিয়ে যেতে পারত, হুলো বেড়াল এসে তার গলার নলী কেটে দিয়ে যেতে পারত, ধেড়ে ইঁদুর এসে টুকে দিতে পারত হাত পা বা চোখ। তার চেয়েও বিপদের কথা নীচু ভিতের সেই আঁতুড় ঘরে বৃষ্টির তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়তে পারত গোক্ষুর বা কেউটে। তার চেয়েও বেশী অমোঘ ছিল যা, তা হল বৃষ্টির জল ঢুকে পড়তে

পারত ঘরে।

বস্তুত শেষোক্ত বিপদটিই ঘটেছিল আহাম্মকের। মৃগীরোগী পিসি একা একটেরে ঘরে নবজাতককে পাহারা দেওয়ার সময় তার সদ্যমৃতা মায়ের প্রেতকে দেখতে পেয়ে মূর্ছা যায়। সেই সময় প্রবল বৃষ্টিতে চারদিক ভাসাভাসি, সেই বৃষ্টির জল কয়েক লহমায় ফুলে ফেঁপে উঠে আঁতুড় ঘরের ভিত ধরে ফেলল। তারপর ছাপিয়ে গেল।

আহাম্মকটিকে যখন তোলা হল চ্যাটাই থেকে তখন তার অর্ধেক শরীর ভেজা, শীতে কাঁপছিল থরথর করে, ঠোঁট দুটো নীল এবং গলার স্বর নিস্তেজ।

পিসিকে সকলে দোষারোপ করছিল বটে, কিন্তু পিসিকে দোষ দেওয়া যায় না। আহাম্মকের এই পিসিটি স্বামী পরিত্যক্তা। সে আমলে এরকম ঘটনা হামেশা ঘটত, স্বামী ঘরে না নেওয়ায় দুঃখে দুঃখে জর্জরিত পিসির মৃগী রোগ দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু আঁতুড়ঘরে ভূত দেখার ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ এর পরেও আহাম্মকের মৃতা মায়ের প্রেত সে বাড়ির বহুজন দেখেছে।

মল্লিকবাড়ি বিশাল এবং বহুভাগে বিভক্ত। শরিকদের অনেকেই ভিন্ন হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন, তবু যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখনই মল্লিকবাড়িতে কম করেও দশটি পরিবার। ছোটো তরফ জয়ধ্বজ নারায়ণগঞ্জে রীতিমতো বড় বাড়ি করেছেন। তাঁর কারবারও সেখানে। তবু দেশের বাড়ির মায়া তাঁর এমনই গভীর ছিল যে, নিজের পরিবারকে তিনি নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরিত করেননি।

আহাম্মকটি সেই বিশাল বাড়িতে কিছু অনাদরেই পালিত হতে লাগল। জন্মলগ্নে মাতৃহারা হলে যে কোনো শিশুরই কিছু অযত্ন অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু জয়ধ্বজের স্ত্রী চিররুগ্না হওয়ায় শিশুটির দিকে নজর দেওয়ার তেমন কেউই ছিল না। মৃগীরোগী পিসি শিশুটি সম্পর্কে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এই শিশুটির ওপর ভূতের ভর রয়েছে। না হলে সদ্যোজাত শিশু কি অত জোরে চেঁচায়? না কি অত বড় বড় করে তাকায়? নাকি অত দুধ একবারে খেতে পারে? নাকি অত মোটাসোটা এবং বড়সড় হয়?

এ ব্যাপারে পিসির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত নই, আহাম্মকটি ভূতে-পাওয়া নয়, এমন কথা আমরা বলছি না। কিন্তু শিশুটির কান্নার যে জোরালো শব্দটি শোনা যেত তার কারণ তার অপরিসীম ক্ষুধা। তাকে

নিয়মিত দুধ খাওয়ানোর জন্য কেউ তো মোতায়েন ছিল না। জয়ধ্বজের স্ত্রী, অর্থাৎ শিশুটির ঠাকুমা, বিছানায় শুয়ে শুয়েই শিশুটির দিকে তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব, নজর রাখতেন। তিনিই বাড়ির কোনো দাসী বা শরিকদের কারো বউকে ডেকে শিশুটিকে খাওয়ানোর কথা বললে এবং উদ্দিষ্ট মহিলা বা দাসীর হাতে সময় থাকলে এবং দুধের জোগাড় ও দুধ গরম করার মতো ইন্ধন পাওয়া গেলে শিশুটির কপালে খাওয়া জুটত। বলাই বাহুল্য সেটা যথেষ্ট ছিল না, মাতৃস্তন্যের পিপাসা তার থেকেই যেত। সে তারস্বরে এই সংবাদটাই পৃথিবীর কাছে নিবেদন করতে চাইতো মাত্র। আর একথা কে না জানে যে, ক্ষুধার চিৎকারই পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরালো : বড় বড় যে চোখের অভিযোগ উঠেছে তা তার মায়ের সূত্রে পাওয়া। ভদ্রমহিলার চোখ দুটি ছিল বাস্তবিকই বিশাল। ছেলেটি যে মোটাসোটা ছিল তা কিন্তু মোটেই নয়। তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় তার কাঠামোটি বড় ছিল মাত্র।

শিশুটির মায়ের শ্রাদ্ধ মিটে যাওয়ার তিন দিন পর শিশুর বাপ ফিরে এলেন এবং মোটামুটি নিস্পৃহভাবে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন এবং আরো নিস্পৃহভাবে পুত্রমুখ দর্শন করলেন। লোকটির মধ্যে দার্শনিকতা ছিল জন্মগত। সব দেখেশুনে একবার শুধু স্বগতোক্তি করলেন, একজন গেছে, আর একজন এসেছে। লাভে লোকসানে মাথায় মাথায়।

স্ত্রী-বিয়োগে লোকটির দুঃখিত না হওয়ার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। স্ত্রী ছিলেন অসম্ভব কোপন স্বভাব ও ঝগড়ুটে। লোকটার জীবনে শান্তি ছিল না। তবে পুত্রমুখ দর্শনে তাঁর আরো একটু খুশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ বিয়ের সাত বছরে তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। এইটিই তাঁর একমাত্র সন্তান। তাও মেয়ে নয়, ছেলে। লায়াবিলিটি নয়, অ্যাসেট। আসলে বিশ্বেশ্বর ছিলেন শিল্পী মানুষ। সাংসারিক বন্ধন তাঁর কাছে বাধাস্বরূপ ছিল। তাই পুত্র তাঁকে তেমন মায়ায় ফেলতে পারেনি। জন্মমাত্র মাকে হারিয়ে, আকস্মিক জলে ডুবে যেতে যেতে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে এবং ক্ষুধার্ত চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে দিয়েও পারেনি। তিনি বাঁশি ও কণ্ঠসংগীত দুইয়েতেই পারদর্শী ছিলেন। পুত্রমুখ দর্শনের সাত দিনের মধ্যে ঢাকা রেডিওতে গান গাইতে চলে যান। শিশুটি একরকম পরের দয়াতেই পড়ে রইল। তার দুই জ্যাঠার মধ্যে বড় জন বিয়ে করেননি। মেজোজন বিয়ে করে নারায়ণগঞ্জেই সংসার পেতেছিলেন, কারণ সেখানে রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার জন্য লোক দরকার ছিল। শিশুটির ভাগ্য সেদিক দিয়েও বিড়ম্বিত বলা যায়।

বেওয়ারিশ এই শিশুটি বাড়ির অন্যান্য বালকবালিকার খেলার পুতুলের

মতো হয়ে উঠেছিল। তারা তাকে নাকে গাল টিপে, পেটে চিমটি কেটে. নাকমুখ চেপে ধরে, আদর করে নানারকম উৎপীড়ন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করতই। শিশুটি যে বিনা প্রতিবাদে তা হজম করত এমন নয়। কিন্তু তার পক্ষে সওয়াল করারও তো বিশেষ কেউ ছিল না। একদিন একটি বালিকা শিশুটিকে নিয়ে ছাদে ওঠে এবং তারপর আচার চুরি করার কথা মনে পড়ায় তাকে ছাদে এক কোণে ফেলে রেখে নীচে নেমে আসে। কিন্তু আচার চুরি করার পর খেলুড়িদের ডাকে গঙ্গা-যমুনা খেলতে চলে যাওয়ায় ছাদে পরিত্যক্ত শিশুটির কথা তার মনে ছিল না।

আহাম্মকটা তখন হামাগুড়ি দিতে শেখেনি, তবে চিত্ত উপুড় হতে শিখে গেছে। ছাদের কর্কশ শানে কিছুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে এবং চিৎকার করে ফল না হওয়ায় সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেওয়ার চেষ্টায় উপুড় ও চিত্ত হতে হতে অর্থাৎ গড়াতে গড়াতে বহুদূরে গিয়ে রেলিঙে ঠেকে যায়। ফের পাল্টা গড়াতে শুরু করে। এইভাবে বহুক্ষণের চেষ্টায় সে সিঁড়ির মুখে চলে আসে।

শক্ত জান তার। একদম প্রথম সিঁড়ি থেকে তার শরীরটা বলটান খেতে খেতে অন্তত দশ ধাপ গড়িয়ে যায়। প্রত্যেকটা সিঁড়িতেই রক্তের ছোপ রেখে গিয়েছিল সে। শেষ দিকটায় তার জ্ঞান ছিল না।

এই অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করেছিল সেই মৃগীরোগী পিসি। প্রথমটায় পিসির হাতে পায়ে সাড় ছিল না। এটা যে ভুতুড়ে কাণ্ড সে বিষয়ে তার সন্দেহ থাকার কারণ নেই। মৃতা মা-ই যে তার শিশুকে অনাদর ও স্নেহবঞ্চিত পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে তাও কি বলে দিতে হয়?

সেই দিনই নাগাসাকি ও হিরোসিমায় পরমাণু বোমা ফাটে। লোকে আজও বলে, সেই পরমাণু বোমা পৃথিবীর উপরিভাগে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে সব কিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে, বদলে গেছে। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, জিনিসের দাম, ঐতিহ্যের মূল্য সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন আনল সেই দুটি পরমাণু বোমা। যার একটির নাম ফ্যাট ম্যান আর একটির নাম লিটল বয়।

সম্ভবত তারই প্রভাবে পিসি সেই রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্য দেখেও মূর্ছা গেল না, বরং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। আর নেওয়ামাত্রই অচেতন শিশু বুক কাঁপিয়ে একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। পিসি তার গালটি নিজের গালে চেপে ধরে বলল, আহা রে!

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পরমাণু বোমার প্রভাবেই আহাম্মকটা তার জীবনে

প্রথম একটি কোল পেল। একটি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ কোলের অভাবেই না আমাদের যত বিপত্তি!

তবে কোনো সুখই জীবনে নিরবচ্ছিন্ন নয়। শিশুটি একটি কোল পেল বটে, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আর একটি কোল হারাল। আর সেই কোল হল জন্মভূমি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামার কিছু পরেই দেশের স্বাধীনতা ও তৎসহ দেশবিভাগের গুজব ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই মল্লিকবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল প্রায়। কয়েকজন গোঁয়ারগোবিন্দ, কতিপয় আশাবাদী ও জনাকয়েক নিরুপায় লোক ছাড়া গোটা গ্রামটাই মুক্তকচ্ছ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটল।

চিন্তিত জয়ধ্বজ দেশের বাড়িতে এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ তাঁর অভিপ্রেত বটে, কিন্তু এত বড় কারবার রাতারাতি গুটিয়ে ফেলা তো সম্ভব নয়। আর গুটিয়েই বা লাভ কী?

আহাম্মকটি তখন মাত্র হাঁটতে শিখেছে। পৃথিবীর কোনো কিছুকেই তখনো সে প্রশ্ন করতে শেখেনি। কিন্তু পরবর্তী কালে এই মৌলিক প্রশ্ন সে তুলেছিল, দেশভাগের সময় গণভোট নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং দেশের শতকরা কতজন লোক দেশ ভাগকে সমর্থন করেছিল! লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের রুজি-রোজগার, বাস্তু ও অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়েছিল কিনা! কতিপয় সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থানরত মানুষ অর্থাৎ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রসম্মত কিনা। যে-দেশের মানুষ বিনা প্রতিবাদে বা নিষ্ফল আক্রোশে প্রায় সব কিছুই মেনে নেয় সেই ভারত ছাড়া অন্যত্র এরকম দেশভাগ সম্ভব ছিল কিনা! সবচেয়ে বড় কথা এত বড় হ্যাপা সামলানোর জন্য যথোচিত ব্যবস্থা দুই দেশেই নেওয়া হয়েছিল কিনা।

অবশ্য এই সব ক'টি প্রশ্নেরই উত্তর যে নেতিবাচক তা আহাম্মকটিরও বুঝতে বেশী দেরী হয়নি।

মল্লিকবাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। অবশ্য খুবই অনিচ্ছা ও ভয়ের সঙ্গে। কয়েকটি মুসলমান যুবক বার বার হানা দিয়ে দেখে যাচ্ছিল পতাকাটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে কিনা। না, পতাকা নামানো হয়নি। তার কারণও ছিল না। মল্লিকবাড়ির লোক পতাকার মূল্য বুঝত না। একটা কিছু উড়ছে এটাই বিস্ময়কর।

জয়ধ্বজ পাকিস্তান না ভারত কোথায় অবস্থান করবেন সে বিষয়ে পাকা সিদ্ধান্ত নিতে না পেরেই নারায়ণগঞ্জে ফিরে গেলেন। তবে তাঁর মধ্যম পুত্র তাঁকে সৎ পরামর্শ দিল, এদিকটা আমি সামলাই, আপনি ওদিকে গিয়ে একটা বাড়িঘর যাহোক খাড়া করুন। তা করতে করতে আমি কারবার গুটিয়ে গিয়ে জুটবখন। কারবার গোটানোর প্রস্তাবে জয়ধ্বজ দ্বিধাগ্রস্ত। এই বয়সে আর এক কারবার গুটিয়ে ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে নতুন কাববার খোলার মতো উদ্যম তাঁর অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, কারবার থাক। কলকাতায একটা আশ্রয় খাড়া করে আসি। দরকার হলে গিয়ে যাতে মাথা গোঁজা যায়।

জয়ধ্বজ তখন নগদ টাকার যথেষ্ট টানাটানিতে পড়েছেন। তিনি টাকা বসিয়ে রাখতে ভালবাসতেন না, টাকাকে খাটাতেন। অর্থাৎ লগ্নী করতেন। তাঁর সব টাকাই তখন কারবারে খাটছে। তাছাড়া নগদ টাকার বেশীর ভাগই চলে যেত বড় ছেলের বিলেত-বাসের খরচে। প্রায় টানা দশ বছর সিদ্ধেশ্বর বিলেতে আছে। সেখানে সে কী শিখছে বা কী করছে তা জয়ধ্বজ বিস্তারিত জানতেন না। তবে অর্থোপার্জন যে কবছে না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যার ফলে মাসান্তে তাঁকে মোটারকম টাকা পাঠাতে হত। ফলে নগদ টাকায় বেশ টান পড়েছিল। জয়ধ্বজ আরো একটা বোকামি করেছিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তিনি দেশে বিস্তর জমিজমা খরিদ করেন এবং মল্লিকবাড়ির লাগোয়া একটা বাস্তুজমি কিনে সেখানে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণের জন্য আগাম কিছু মার্বেল পাথর ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী কিনে রাখেন। সেই টাকাগুলি প্রায় জলে গেল। এখন পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ কলকাতায় গিয়ে একটা বাড়িঘব খাড়া করতে হলে টাকা দরকার। সুতরাং জয়ধ্বজ বাধ্য হয়ে কিছু সোনা বিক্রি করলেন। এবং কিছু আদায় উসুল করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো আদায় জোগাড় করে পশ্চিমবঙ্গে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে মধ্যম পুত্র সর্বেশ্বর বলল, বাবা, বিদেশে যাচ্ছেন, ওকালতনামা দিয়ে যান। নইলে কারবারে অসুবিধে হবে। কথাটা যুক্তিযুক্ত। জয়ধ্বজ আপত্তি করলেন না, ওকালতনামা বা পাওয়ার অফ এটর্নি দিয়ে গেলেন।

জয়ধ্বজ অবশ্য কোনোদিনই কলকাতা পৌঁছোতে পারেননি। কোথায় পৌঁছেছেন সে বিষয়েও কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী ছিল। তারও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সকলেই ধরে নিল, জয়ধ্বজ ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন। হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশভাগের সময় দেশত্যাগের হিড়িকে যে ডামাডোল পড়ে গিয়েছিল

তার সুযোগে গাঁ গঞ্জে খালে বিলে প্রচুর লোক ডাকাতি করতে নেমে পড়ে। তবে জয়ধ্বজের নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে কতিপয় আশাবাদীর কথাও প্রণিধানযোগ্য। এঁদের ধারণা জয়ধ্বজের হঠাৎ বৈরাগ্য আসে এবং তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। যাওয়াব আগে সঙ্গী কর্মচারীটিকে সব টাকা-পয়সা দান করে গিয়েছিলেন। সেই কর্মচারীটি কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয়ে সেই কর্মচারীটি নিজের পূর্বপরিচয় মুছে ফেলে নতুন মানুষ হয়ে গেছে। বিগতযৌবনা স্ত্রী ও অপোগণ্ড সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সে আবাব একটি খিয়ে করেছে। সিঁথিতে তার এখন তিন তলা বাড়ি, গ্যাবেজে গাড়ি। নৈরাশ্যবাদীদের একদল এ কাহিনীব দ্বিতীয় অংশকে অবিশ্বাস কবে না। তারা বলে, কর্মচারীটি আসলে জয়ধ্বজকে খুন করে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বডলোক হয়েছে। ধরা পড়ার ভয়ে সে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আশাবাদীদের এক অংশ বলে যে, না, তা নয়। কর্মচারীটিও জয়ধ্বজের সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়েছে।

যাই হোক, জয়ধ্বজের মৃত্যু বা বেঁচে থাকা যে রহস্যাবৃত এ বিষযে সন্দেহ নেই।

জয়ধ্বজ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলেতে খুবই বিপদে পড়ে গেলেন। হিটলার যখন লণ্ডনে নাগাড়ে বোমা ফেলেছিল তখনকার চেয়েও তাঁর বিপদ বেশী হয়ে দাঁড়াল দেশ থেকে টাকা বন্ধ হওয়ায়। আগে তিনি মাসে একখানা চিঠি দিতেন। টাকা বন্ধ হওযায় সপ্তাহে তাঁর দুটো করে জরুরী চিঠি আসতে লাগল। সর্বেশ্বর বেশীর ভাগ চিঠিই না পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। অবশেষে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তিনি জানিয়ে দিলেন, আব টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ দেশ ভাগ হয়েছে, জয়ধ্বজ নিরুদ্দেশ এবং কারবাবের অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

কারবারের অবস্থা সঙ্গীন কিনা তা বলা শক্ত। তবে বুদ্ধিমান সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জে অবস্থান করা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেননি। তিনি ধীরে ধীরে ব্যবসা গোটাতে লাগলেন। হুণ্ডির মাধ্যমে কিছু কিছু করে টাকা কলকাতায় পাঠাতে লাগলেন। সে টাকা ব্যাংকে জমা হতে লাগল।

বজ্রযোগিনী গ্রামে বিশাল মল্লিকবাড়ির অবস্থাটি প্রায় হানাবাড়ির মতো। শরিকদের মধ্যে দুটি পরিবার ছাড়া আর কেউই নেই। এরই মধ্যে একদিন বিনা আড়ম্বরে আহাম্মকটির ঠাকুমা ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর জন্য শোক করার বিশেষ কেউ ছিল না। খবর পেয়ে সর্বেশ্বর এসে মায়ের শ্রাদ্ধ

করে গেলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জয়ধ্বজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়নি বলে তাঁর স্ত্রী সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা নিয়েই চিতায় ওঠেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটা আরো ফাঁকা হয়ে হাঁ-হাঁ করতে লাগল। আহাম্মকটির বিপদ আরো বাড়ল। সে আর তাব পিসি ছাড়া তাদের অংশের বাড়িতে আর কেউ নেই। পিসিব মৃগী রোগ দেখা দিলে আহাম্মকটিকে দেখাশোনাব কেউ ছিল না। পিসির মূর্ছা যতক্ষণ না ভাঙত ততক্ষণ সম্পূর্ণ দৈবের নির্ভরতায় আহাম্মকটিকে পড়ে থাকতে হত। এই অবস্থায় বার দুই খাট থেকে পড়ে গেছে, নিজের বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব খেয়েছে, পিঁপড়ে মশা এবং অন্যান্য পোকামাকড়েব দংশন সহ্য করেছে।

তবে একথাও ঠিক, সেই অতি শৈশবেও সে বুঝতে পেরেছিল, জীবনটা খুব সুখের হবে না। নিতান্তই অস্তিত্ব বক্ষাব তাগিদে সে খুব তাড়াতাড়ি আত্মনির্ভরশীল হতে থাকে। মাত্র ন'মাস বয়সে সে দাঁড়াতে শিখে যায়। এক বছব বয়সে সে হাঁটতে থাকে। ব্যথা বেদনায় সে আর সহজে কাঁদত না, ক্ষুধা সহ্য কবতে পারত।

আহাম্মকটিকে তার পিসি কালক্রমে খুবই গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে। বাসারই কথা। পিসির সন্তান নেই। আহাম্মকটির নেই মা। এই অবস্থায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে তাদের দেরী হয়নি।

আহাম্মকটির উড়নচণ্ডী বাবাও এই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনটা আর আগের মতো সুখের নেই। কেমন যেন একটু বেসুর বাজছে। বেসুর বাজছিল ঠিকই। তার কারণ পিছনে আর নিশ্চিন্ত ও অফুরন্ত টাকার প্রস্রবণটি নেই।

বিশ্বেশ্বর অতএব নারায়নগঞ্জের গদিতে হানা দিলেন এবং দাদাব সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হল। কথাবার্তাগুলি অবশ্যই খুব সহৃদয়ভাবে হয়নি। কারণ সর্বেশ্বর স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন যে, বাবার কারবারের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সব বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন এবং তার পর থেকেই নিরুদ্দেশ। সুতরাং কারবারের আয় থেকে ভাগ চাওয়া বৃথা।

একথায় খুবই আকস্মিকভাবে বিশ্বেশ্বর সুরের আকাশ থেকে বাস্তব অবস্থার মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ঝগড়া-বিবাদও সাধ্যমতো করলেন বটে, কিন্তু ফলোদয় হল না। অগত্যা দেশের বাড়িতে ফিরে তিনি সিন্দুক, আলমারি, বাক্স প্যাঁটরা হাতাতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, কোথাও তেমন বিক্রয়যোগ্য মূল্যবান কিছু পেলেন না। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি যখন

সংগীতকে হাটে মাঠে বাটে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে বিচক্ষণ সর্বেশ্বর বার দুই তিন দেশের বাড়িতে হানা দিয়ে মূল্যবান জিনিসগুলির সদ্‌গতি করে গেছেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, তৈজসপত্রের চেয়ে নগদ টাকা এখন অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং তৈজসপত্র জমিয়ে রাখা এখন বৃথা।

আকস্মিক অভাবে পড়ে বিশ্বেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়ানো তাঁর মাথায় উঠল। তাঁর মদ্যপানের অভ্যাস ছিল, বারবণিতা এবং বাঈজীদের পিছনেও যথেষ্ট অর্থব্যয় করতেন। কিন্তু এখন সেই অতীত জীবন তাঁর কাছে স্বপ্নবৎ অসত্য বলে মনে হতে লাগল। অর্থোপার্জন তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কাজ, আবার অর্থাভাবও তিনি সহ্য করতে পারেন না।

দোটানায় পড়ে অত্যধিক মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে করতে তিনি নানারকম কথা বিড় বিড় করে বলতে শুরু করলেন। একা একা নানারকম অঙ্গভঙ্গিও করতেন: এটা অবশ্য পরমাণু বোমার প্রভাবও হতে পারে। কিছু লোক তাই বলত।

দুই : সর্বেশ্বরের কলকাতা যাত্রা ও রহিম শেখের আগমন

শোনা যায় সর্বেশ্বর স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে এবং নিজে লুঙ্গি ও ফেজ টুপি পরে কলকাতা যাত্রা করেন। তাঁর ছয়টি সন্তানকেও মুসলমানী পোশাক পরিয়ে নিতে ভুল করেননি। পথে দাঙ্গাপ্রবণ কিছু এলাকা নিরাপদে পার হয়ে তিনি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় পা দিয়ে বেশ পরিবর্তন করে নেন। তিনটি জমাট দৈ-এর হাঁড়ি ও ক্ষীরের মালসা থেকে লুকোনো প্রায় একশ ভরি সোনার গয়না বের করে সর্বেশ্বরের স্ত্রী তা পেটকোঁচড়ে বেঁধে নিলেন। পরিত্যক্ত দৈ ও ক্ষীর খাওয়ার জন্য তাঁদের পুত্র-কন্যারা বায়না ধরেছিল। স্বামী-স্ত্রী ধমক দিয়ে তাদের চুপ করান।

বলাই বাহুল্য, সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জের কারবার খুবই সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিতে পেরেছিলেন। কাউকে এক পয়সা হিস্যা দিতে হয়নি। পুরোনো কর্মচারীরা গাঁই-গুঁই করায় তিনি তাদের কিছু নগদ বিদায় দিয়েছিলেন মাত্র।

সর্বেশ্বর যখন কলকাতায় পা দেন তখন তাঁর বয়স একত্রিশ কিংবা বত্রিশ বছর। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে এমন কিছু বেশী বয়স নয়।

সর্বেশ্বরের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটিও ছিল তীক্ষ্ণ। হাতে বেশ কিছু টাকাও ছিল তাঁর সহায়।

বেনিয়াটোলার গলিতে এক দূর সম্পর্কের শালার বাড়িতে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। আকস্মিক অতিথি-আগমনে শালা এবং শালার বউ মোটেই খুশি হননি। কিন্তু সর্বেশ্বর কিছু টাকার ছবি দেখাতেই শালা ও শালার বউয়ের গোমড়া মুখে কালো মেঘে বিদ্যুতের খেলার মতো হাসি ফুটল।

সর্বেশ্বর টাকার মূল্য জানতেন, ব্যবহার জানতেন, নিয়ন্ত্রণও জানতেন। টাকায় যে পৃথিবীর অধিকাংশ সুখ সুবিধাই ক্রয় করা যায় এ তত্ত্বও তাঁর জানা ছিল। শালার বাড়িতে অবস্থানকালে তিনি যে দরাজ হাতে খরচ করতেন তা নয়। তবে তিনি যে সম্পন্ন ব্যক্তি, সর্বহারা রিফিউজি নন, এ সত্যটা গোপন রাখেননি। তাতেই কাজ হল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা টাকা দেখায়, দানছত্র খুলে বসে না।

বিস্তর ঘোরাঘুরি ও নিরন্তর প্রচেষ্টায় সর্বেশ্বর বড় বাজারে রুমালের পাইকারি কারবার খুললেন। বসা ব্যবসা। বিশেষ ঘোরাঘুরি নেই, মেহনতও কম, ঝুঁকি আরো কম। শিয়ালদহের কাছে গলু ওস্তাগর লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে গেলেন। তারপর থেকে একটি নিরাপদ জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁর ঠিকানা বা হদিশ দেশের বাড়ির লোকেরা বহুদিন পায়নি।

এখন সর্বেশ্বরের প্রসঙ্গ চাপা থাকুক। কারণ আহাম্মকের জীবনে তাঁর আর আপাতত কোনো ভূমিকা নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সর্বেশ্বর টাকায় ক্রয়যোগ্য কিছু সুখ এবং তজ্জনিতই কিছু দুঃখ নিয়ে কলকাতায় কালাতিপাত করতে লাগলেন।

ওদিকে এরই মধ্যে একদিন বজ্রযোগিনী গ্রামের মল্লিকবাড়িতে ডাকাত পড়ল। পড়াই স্বাভাবিক। চারদিকে প্রায়ই তখন ডাকাতি হচ্ছে। এতদিন মল্লিকবাড়িতে কেন ডাকাত পড়েনি সেইটেই প্রশ্ন।

এমন কি আহাম্মকের পিসি এই প্রশ্নটা ডাকাতদের করেও ফেলেছিল। ঘটনাটা হল, একদল ডাকাত প্রথাসিদ্ধ মশাল বল্লম দা ইত্যাদি নিয়ে এক মধ্যরাত্রে মল্লিকবাড়ি চড়াও হল। তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, বাধা দেওয়ার কারণও কিছু নেই। কিন্তু ডাকাতদের হাবভাব খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়, তেমন হাঁকডাকও করছিল না। বরং তাদের বেশ ক্লান্ত ও বিরক্ত বলে মনে হচ্ছিল। কয়েকজন ডাকাত তো রীতিমতো হাই তুলে চোখ রগড়াচ্ছিল। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নাগাড়ে কয়েক মাস প্রতি রাত্রে

ডাকাতি করে করে তাদের উৎসাহে খুবই ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু মল্লিকবাড়িতে ডাকাতি করতে আসা যে নিতান্তই পণ্ডশ্রম এও তারা বাড়িতে ঢুকেই বুঝে যায়।

যাই হোক, কোথাও লুণ্ঠনযোগ্য তেমন কিছু না পেয়ে একজন ডাকাত আহাম্মকের পিসির গলায় রাম দা ধরে জিজ্ঞেস করে, কোথায় কী আছে সুলুক সন্ধান দে।

পিসি হাউমাউ করে কেঁদে কেটে বলে, যখন সব ছিল তখন কোথায় ছিলে তোমরা বাবারা? তখন এলে তো এমন শুধু হাতে ফিরতে হত না!

ন্যায্য প্রশ্ন। ডাকাতটা জবাব দিতে না পেরে একটা হাই তুলল; সম্ভবত সেই হাই-ই তার জবাব। অর্থাৎ, ডাকাতি করে করে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে গেল মা, দিনের পর দিন লোকে আর কত পারে! তোমাদের বাড়ি যে আসব তারও তো একটা হিসেব আছে! এলেই তো হল না। আর সব বাড়ি সেরে তোমাদের পালা এলে তবে তো আসতে হবে!

এই ডাকাতির ঘটনা একটা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণ হলেন বিশ্বেশ্বর। ডাকাত দেখে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে সেই যে ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কোঁ কোঁ করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন সেই কাঁপুনি ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর ভোর হওয়া অবধি আর থামেনি। বলা বাহুল্য, ডাকাতরা কাউকে খুন জখম করেনি। শুধু রাগের চোটে লাথি মেরে কিছু তৈজসপত্র ফেলেছে আর যৎসামান্য কিছু ভাঙচুর করেছে। ঘটি বাটি গোছের কিছু জিনিস তারা নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাতে গৃহস্থের ক্ষতি হলেও তাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নেই। তবু বিশ্বেশ্বর কেন যে ভয় পেয়েছিলেন তা বোঝা দুষ্কর।

পরদিন সকালেই বিশ্বেশ্বর স্থির করে ফেললেন যে, অবিলম্বে ভারতবর্ষে চলে যেতে হবে। এখানে প্রাণ সংশয়।

গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা কমে এসেছে। কিছু লোক মাটি কামড়ে পড়ে আছে বটে, কিন্তু সকলেরই উসুখুশু ভাব। মল্লিকবাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পর অস্বস্তি এবং উদ্বেগ আরো বাড়ল।

বিশ্বেশ্বরের সিদ্ধান্ত রটে যেতে দেরী হল না। মল্লিকবাড়ির ছোটো তরফের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে, এটা খবর হিসেবে তেমন রগরগে নয়; কিন্তু গাঁয়ের মুষ্টিমেয় হিন্দুর কাছে এটা দুঃসংবাদ। বিশ্বেশ্বর কেউকেটা নন, কিন্তু তিনি থাকলে একটা সংখ্যার জোর তো হয়। সংখ্যাই আসল। তিনি চলে গেলে একজন হিন্দু কমে যাবে।

বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সম্বল বিশেষ ছিল না। মেজদা সর্বেশ্বর নারায়ণগঞ্জের ব্যবসা তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁর ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। জয়ধ্বজ নিরুদ্দেশ; বড়দা সিদ্ধেশ্বরের কোনো খবর নেই। বিশ্বেশ্বর প্রায় কপর্দকহীন, কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজনও বিশেষ নেই। সুতরাং হিন্দুস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও যাওয়াটা বাস্তবে ঘটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বেশ্বরের বাস্তববুদ্ধি বিশেষ ছিল না। একটু ভাবের মানুষ। ভাবের মানুষেরা ভাবের মধ্যেই আনন্দ পায়, প্রতিশোধ নেয়, অপ্রাপ্যকে লাভ করে, বাস্তব তাদের কাছে দুর্বোধ্য এবং বর্জনীয়।

যাই হোক যাবো-যাচ্ছি করে বিশ্বেশ্বর শেষ অবধি গাঁয়েই পড়ে রইলেন। বিশাল মল্লিক বাড়ির প্রায় সবটাই ফাঁকা। এক অংশে বিশ্বেশ্বর, তাঁর রোগগ্রস্ত দিদি ও নিতান্তই নাবালক পুত্র। অন্য এক অংশে তাঁর এক জ্যাঠতুতো দাদা, তাঁর স্ত্রী ও একটি হাবাগোবা মেয়ে। দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। বিশ্বেশ্বর একা একা বিড়বিড় করতেন এবং হাটে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন বেঁটে খাটো এবং গাট্টা-গোট্টা চেহারার একজন লোক এল। তখন ভোরবেলা এবং চারদিক শরতের রোদে ভারী প্রসন্ন। লোকটি কাঁধ থেকে একটা তোরঙ্গ উঠোনে নামিয়ে তার ওপর বসে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তার পরনে একটা চেককাটা লুঙ্গি এবং গায়ে হাতাওয়ালা একটা গেঞ্জি। সামান্য দাড়ি আছে, তবে গোঁফ কামানো। লোকটি অপরিচিত। হাবভাব সন্দেহজনক। বিশ্বেশ্বর তাকে দেখে ভয় খেয়ে দিদিকে গিয়ে বললেন, একটা লোক এসেছে, গতিক সুবিধের নয়। লোকজন ডাক তো!

দিদির মৃগী রোগ থাকলেও বিশ্বেশ্বরের মতো ভীতু নয়। আহাম্মককে কোলে নিয়ে দিদি গিয়ে লোকটার মুখোমুখি হল।

কাকে চাই আপনার?

একটু জল খাওয়াবেন মা? অনেক দূর থেকে আসছি। আমার ঘটি আছে। বলে লোকটা উঠে তোরঙ্গ খুলে একটা ঘটি বের করল। তারপর বলল, ফজরের নমাজটা পড়া হয় নাই। একটু ওজু করে নিই আগে।

পিসি জল এনে দেয়। রহস্যময় লোকটা হাত মুখ ধুয়ে নমাজ পড়তে থাকে মল্লিকবাড়ির উঠোনে। আহাম্মক আর তার পিসি হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে।

নমাজের পর লোকটা একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, বাড়িতে পুরুষমানুষ

কেউ নাই ?

আছে। কেন বলুন তো ?

একটু ডেকে দেন। কথা আছে।

অগত্যা বিশ্বেশ্বরকে গুটি গুটি গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়াতে হল।

লোকটা তোরঙ্গ খুলে এক বাণ্ডিল কাগজ বের করে বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়ে বলল, সব দেখেশুনে নেন!

বিশ্বেশ্বর খুবই ঘাবড়ে গেছেন। তবু বিজ্ঞের মতো ভ্রু কুঁচকে হাতের বাণ্ডিলটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি শিক্ষিত বটে, তবে সাংসারিক ব্যাপারে কোনো আগ্রহ না থাকায় অনেক কিছুই তাঁর অজানা রয়ে গেছে। কাগজপত্রগুলো জমির দলিল ও চুক্তিপত্র বলেই তাঁর মনে হল। বললেন, এটা কী ?

লোকটা বলল, আমার নাম রহিম শেখ। বাড়ি বর্ধমান। কিছু জমিজমা আছে সেখানে, পাকা বাড়ি। সেই বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির জয়ধ্বজ মল্লিকের অংশ বদল করে নিয়েছি। কাগজপত্রে সব লেখা আছে।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় বজ্রাঘাত হল। বললেন, সে কী! আমার বাবা তো নিরুদ্দেশ। বদল করল কে ?

আপনি জয়ধ্বজ মল্লিক মশাইয়ের ছেলে ?

হ্যাঁ।

আফশোসের কথা। এ বাড়িতে আপনি আছেন তিনি তো বলেন নাই।

কে বলেনি ?

সর্বেশ্বর মল্লিক মশাই।

সেজদা ? তাকে আপনি কোথায় পেলেন ?

তিনি কলকাতায় থাকেন। দালালের মাধ্যমে যোগাযোগ।

কিন্তু তিনি সম্পত্তি বিনিময় করবেন কী করে ? সম্পত্তি তো তাঁর একার নয়।

জয়ধ্বজ মল্লিকের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তাঁর আছে।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কথাটা যেন জীবনে প্রথম শুনছেন এমনভাবে চেয়ে রইলেন বিশ্বেশ্বর।

রহিম শেখ প্রকৃত দুঃখিতভাবেই বলল, কাগজপত্র সব ঠিক আছে, বদলের ব্যাপারে কোনো গোলমাল নাই। তবে আপনি যে এখানে থাকেন সে কথাটা ওঁর বলা উচিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর বসে পড়লেন। বললেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

তবে বুঝতে তাঁকে হল । গাঁয়ের মাতব্বরেরা সকলেই দলিল-টলিল দেখে রায় দিল, জয়ধ্বজ মল্লিকের সম্পত্তি রহিম শেখেরই পাওনা। কোনো গোলমাল নেই।

কিন্তু রহিম শেখ লোকটি যথার্থই ভাল। রাত্রে সে বিশ্বেশ্বরদের অংশে নীচের তলার একটা অব্যবহৃত ঘরে রইল। বিশ্বেশ্বরের দিদি রান্না করে তাকে পাঠাল। লোকটা নিজের সানকীতে ভাত খেয়ে বিশ্বেশ্বরকে বলল, আপনাদের ভিটেছাড়া করার কিছু নাই। আমার পরিবার ছোটো। তাছাড়া আপনার বাবা নিজস্ব বাড়ি করার জন্য যে জমিটা কিনেছিলেন আমার ইচ্ছা সেখানেই বাড়ি করে থাকি। আপনারা দু-পাঁচ বছর এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন।

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রহিম শেখ থাকতে বলছে, সে ভাল। কিন্তু থাকবেন সে, খাবেন কী? চাষের জমি থেকে যে সামান্য আয়ে সংসার চলছিল তাও যে রহিম শেখের দখলে। সহোদর ভাই যে এত বড় শত্রুতা করতে পারে তা তাঁর স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বিশ্বেশ্বর সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। পরদিন সকালে যখন শয্যা ত্যাগ করলেন তখন তাঁর চোখ টকটকে লাল, গায়ে জ্বর এবং একটু অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। মাঝে মাঝে সজোরে বলে উঠছেন, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি! পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি!

একথা সবাই বুঝল, বিশ্বেশ্বরের দুর্বল মন এত বড় আঘাত সইতে পারছে না। আমাদের আহাম্মকটির নাম রাখা হয়েছিল মাধব। মাধবের বয়স এই ঘটনার সময় তিন সাড়ে তিন বছর। রহিম শেখের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। প্রায়দিনই সকালবেলায় পিসি তার কোঁচড়ে মুড়ি বেঁধে দিত। সেই মুড়ি খেতে খেতে টুকটুক করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসত নীচে, রহিম শেখের ঘরে। দুজনে কিছু গল্প-সল্প করত।

ক্রমে দেখা গেল, রহিম শেখ মানুষটিকে যতটা ভাল মনে হয়েছিল লোকটা তার চেয়েও ভাল। প্রকৃত ধর্মভীরু এবং দয়ালু মানুষ। পাছে পরিবার নিয়ে এলে বিশ্বেশ্বরকে ভিটে ছাড়া করাতে হয়, সেই ভয়ে সে বছরখানেক নিজের পরিবারকে আনল না। জয়ধ্বজের কেনা জমিটায় একটা টিনের ঘর দাঁড় করানোর পর দেশ থেকে বউ আর চারটে বাচ্চাকে নিয়ে এসে সেখানেই থাকতে লাগল। কিন্তু রহিমের মহত্ত্বের শেষ এখানেই নয়। বিশ্বেশ্বরের যে তার জন্যই হাঁড়ির হাল হয়েছে এটা বুঝে নিয়ে সে নিজে চাষবাস করে কিছু ধান চাল তাদের দিত। বলতে কি, সেটাই ছিল বিশ্বেশ্বরের

এবং তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান সম্বল।

মাধবের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন সে মানুষ চিনতে শিখে গেছে। হিন্দু ও মুসলমানের তফাৎ সে তখন ভালই বোঝে। সেই বয়সেই মাধব নিজের জামাকাপড় নিজে কেচে নেয়, খাবার না জুটলে বায়না করে না। কখনো কোনো অবস্থাতেই সে কাঁদে না, ভূত বা অন্যান্য অলৌকিক জিনিসকে ভয় খায় না, কোনো জিনিসের অপচয় করে না। সেই বয়সের পক্ষে তার সাবালকত্ব বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নয়, কারণ তার বাবা বিশ্বেশ্বর তখন একরকম পাগল হয়ে গেছেন। পিসির ফিটের ব্যামো তো আছেই। এই অবস্থায় নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে না জানলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হত। মানুষ নিতান্ত অবোধ অবস্থাতেও অস্তিত্বের সংকট টের পায়। চাপে পড়লে সে অস্তিত্বের খাতিরে নানা অসাধ্য সাধন করে ফেলে।

বাল্যকালের সেই সুন্দর সময়টা মাধবের বড় কষ্টে কেটেছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট ছিল ক্ষুধা। ভাতের অভাব থাকার দরুন মাধব প্রাকৃতিক ফলমূল সংগ্রহ করে যতটা পারে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করত। পেয়ারা, কুল, জাম, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঋতুর ফল সেইসব ঋতুতে তার পুষ্টির যোগান দিত। তা বলে সেগুলো যে অনায়াসলভ্য ছিল তা নয়। মাধবকে প্রায়ই এসব চুরি করতে হত। ঠিক কোন বয়সে সে চুরি করতে শেখে তা আজ আর তার মনে নেই। কিন্তু যখন তার প্রায় দশ বছর বয়স তখন গাঁয়ের এক্রাম আলি তাকে একবার থানায় জমা করে দিয়ে আসে। এক্রামকে দোষ দেওয়া বৃথা। তার পুকুর থেকে প্রায়ই মাছ চুরি যেত। চোর ধরা পড়ে। মাধব। সেবার এক্রাম শুধু ধমক দিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর চুরি যায় এক্রামের একটা গরু। ফের মাধব। এরপর মাধব চুরি করে এক্রামের ফুফুর একটা কাঁসার ঘটি। ঘটিটা বুড়ি ঘাটে ফেলে এসেছিল। ফিরে গিয়ে দেখে নেই। একটু খুঁজতেই মাধবদের বাড়ি থেকে ঘটিটা বেরোয়।

থানায় জমা হলেও মাধবকে হাজতবাস করতে হয়নি। রহিম শেখ গিয়ে বলা-কওয়া করায় এবং ছোটো বলে দারোগার দয়া হওয়ায় সে ছাড়া পেয়ে যায়।

জ্যোৎস্নারাত্রিতে থানা থেকে ফিরছিল মাধব আর রহিম। রহিম তাকে বলছিল, চুরিধারি লোকে করে বটে, কিন্তু কাজটা বিজ্ঞজনোচিত নয়। এ কাজের জন্য অন্য রকম জান আর জবান লাগে। শয়তানকে গুরু ধরতে হয়। তুমি বাবা, শয়তানের মানুষ নও। এইটুকু বয়স থেকে তোমাকে জানি।

মাধব খুব ভয় খেয়েছিল। থানা-পুলিশের কথা সে শুনেছে বটে, অভিজ্ঞতা এই প্রথম, এক্রাম যখন তাকে থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে প্রাণপণে হাত ছুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে আর হাঁপিয়েছে। ভয়ে তার গলা বসে গিয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। থানায় তাকে একজন সেপাই রুল দিয়ে দুটো গুঁতো আর কোমরে একটা লাথি মেরেছিল। ভয়ে তখন সে কেন যে অজ্ঞান হয়ে যায়নি সেটাই বিস্ময়ের।

রহিম তাকে বলল, ছোটোলোকের ছেলে তো তুমি না। এ কাজ কি তোমার সয়? ছোটোলোকদের পাপ সয়, তাদের জন্মই তো ওর মধ্যে।

সেই বয়সে অন্য সব ছেলের মতোই মাধব গল্প শুনতে ভীষণ ভালবাসত। ফিটের ব্যামোওলা পিসি তার সেই গল্প-ক্ষুধা তেমন মেটাতে পারত না। তবে পিসির কাছ থেকে সে নিজেদের অতীত ইতিহাস শুনে দুটো স্বপ্ন প্রায়ই দেখত। এক হল, দাদু জয়ধবজ মল্লিক পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছেন। অন্যটা হল, বড় জ্যাঠা বিলেত থেকে বড়লোক হয়ে ফিরে এসেছেন।

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরা দুজনেই একদিন ফিরে আসবেন এবং তাদের দুঃখের দিন শেষ হবে।

অবশ্য এও ঠিক, সুখ দুঃখ ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝত না মাধব। সে জন্মেছেই এক প্রগাঢ় দারিদ্র্যের অবস্থায়। জ্ঞান বয়সে সুখের দিন সে দেখেনি। কাজেই দুঃখ বা অভাব তার গায়ে লাগত না। একটা কামরাঙা বা মাদার ফলের মধ্যেও সে অমৃতের স্বাদ পেত, কদন্নে তার অরুচি হত না, উপবাস যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তা তার কখনো মনে হয়নি।

একটু বেশি বয়সেই সে স্কুলে যেতে লাগল এবং পড়াশুনোটা যে একটা বাজে ব্যাপার এটা বুঝে ফেলতে তার একটুও দেরী হল না। সে স্কুল পালাত, স্কুল কামাই করত। এ ব্যাপারে তাকে শাসন করার লোক না থাকায় তার সুবিধেই হয়েছিল।

মাধবের প্রতি আর কেউ নজর না রাখলেও রহিম শেখ রাখত। এই পরিবারটির প্রতি তার কিছু সহানুভূতি বরাবরই ছিল। বড় অসহায় পরিবার। রহিম শেখ নিজে সামান্য লেখাপড়া জানে, কিন্তু বিদ্যা জিনিসটার প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের সে এ ব্যাপারে একটুও প্রশ্রয় দিত না। মাধবকে সে একদিন ধরে বলল, তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো বাবা! ফাঁকিটা দিচ্ছো কাকে? ভদ্রলোকের খাতায় নাম তুলতে হবে না তোমাকে?

আমার ভজর ভজর করে বসে বসে পড়তে ভালো লাগে না।

আমারও তো চাষবাস করতে ভাল লাগে না। কেবল ইচ্ছে করে দাওয়ায় বসে তামাক খাই আর আবু হোসেনের খোয়াব দেখি। ও বললে হবে না। আমার ছেলেগুলো পড়ে, তুমি তোমার পাততাড়ি নিয়ে ওদের কাছে চলে এসো রোজ। সঙ্গে মিশলে পড়া হয়ে যাবে। মুড়ি কদমা দেবোখন, যাও।

রহিম শেখের চার ছেলেই মাধবের চেয়ে বয়সে বড়, পড়েও উঁচু ক্লাসে, তবে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব মাধবের। ছেলেগুলো [illegible], শান্ত স্বভাব এবং বুদ্ধিমান। বাপের মতো তাদের চরিত্রেও মায়ামমতা আছে। চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি ছিল বুড়ান। তার একটা পোশাকী নাম ছিল বটে, কিন্তু বুড়ান নামটাই চলত। চার ভাইয়ের মধ্যে তার একটুতেই কিছু দুষ্টুমি ও চঞ্চলতা ছিল। পড়াশুনোয় মন কম। মাধবের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্ধু হয়ে উঠতে দেরী হয়নি। মাধব রোজ ভোরবেলা উঠে রহিম শেখের বাড়ি পড়তে যেত। এই পড়তে যাওয়ার পিছনে কারণ একটাই। মুড়ি কদমার আশ্বাস। মাধবদের বাড়িতে জলখাবারের প্রথা প্রায় উঠেই গিয়েছিল। মুড়িরও তখন অনটন। ভাতেরও নিশ্চয়তা নেই। সকালবেলাটায় দারুণ খিদে কুমীরের মতো পেটে কামড়ে ধরত। সেই কামড় দিনভর সহ্য করার চেয়ে একটু পড়াশুনো বরং ভাল। চাচী অর্থাৎ রহিম শেখের বউ মানুষটা ভারী নির্জীব, রোগাভোগা এবং নিশ্চুপ ধরনের। সারাদিন তার গলার আওয়াজ পাওয়া যেত না। কিন্তু মুড়ি কদমার ব্যাপারে তার ভুল হয়নি কখনো। অবশ্য রোজ কদমা থাকত না, বদলে বাতাসা বা নকুলদানা জুটত। কিছুই খারাপ লাগত না মাধবের। সবই চমৎকার সবই অমৃত। মুড়িটা তার কোঁচড়ে ঢেলে দিয়ে যেত হানা, রহিম শেখের মেয়ে। চার ছেলের পর দুটি মেয়ে। তাদের মধ্যে বড় হল হানা। মাধবের চেয়ে সে ছোটই হবে। তবে বেশি তফাৎ নয়। রহিম শেখের সে বড় আদরের মেয়ে। চোখের মণি। তাই কিছুটা জেদী আর আবদেরে। সানকী থেকে কোঁচড়ে মুড়ি ঢালবার সময় সে রোজ মাধবকে মুখ ভেঙাত।

মূল বড়যোগিনী গ্রাম থেকে তাদের বাসস্থান ছিল একটু দূরে। মূল গ্রাম প্রায় মাইল খানেক দূর। মাঝখানটায় জলা জমি, চাষের ক্ষেত ইত্যাদি ছিল। এই পথটুক হেঁটে পার হয়ে স্কুলে যেতে হত। এই পথের আশেপাশেই ছিল মাধবদের জমি। এখন সেই জমি চাষ করে রহিম শেখ।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে তারা দেখল বাঁ ধারের মাঠে কিছু লোক

জড়ো হয়েছে। খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। তারা -অর্থাৎ মাধব ও রহিম শেখের ছেলেরা দৌড়ে মাঠে নামল দেখতে।

দৃশ্যটা ভয়ংকর। রহিম শেখ মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। পায়ে শক্ত বাঁধন। তাকে সাপে কামড়েছে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। চোখ ওল্টানো, একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

দৃশ্যটা কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে দেখল সে। তারপর আচমকা তার বুকে হাঁ হাঁ করে উঠল একটা ভয়। সে ছুটতে লাগল। রহিমের ছেলেরা যখন তাদের বাপজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করছে তখন মাধব কলাবাড়ির বেলগুঁড়ির মতো এক দমে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল। সে এক দিকবিদিকশূন্য দৌড় কোথায় যাচ্ছে তা সে জানত না। শুধু মনে হয়েছিল কোথাও পালিয়ে যাওয়া দরকার।

৩: রহিম শেখের মৃত্যু ও ইব্রাহিমের আগমন

রহিম শেখের মৃত্যু ঘটল খুবই অনাড়ম্বরভাবে। বাড়িতে শোকার্ত কান্না এবং প্রতিবেশীদের সমবেদনা সবই হল নিয়মমাফিক। কিন্তু মল্লিকবাড়ির প্রতিক্রিয়াটা ছিল আরো গভীর। বিশ্বেশ্বর পাগলাটে হলেও একেবারে বোধশূন্য নন। রহিম শেখের মৃত্যু যে তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে ঠেলে দিল সেটা তিনি ভালরকমই বুঝেছিলেন। দুদিন কথাবার্তা বন্ধ রইল তাঁর। শশী বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাধব সাপের ওপর আক্রোশবশতঃ একটা টাঁটা হাতে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রহিমের মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তার শালা ইব্রাহিম এসে বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিল। বলাবাহুল্য যে রহিম শেখের মতো উদার বা ভাল মানুষ ছিল না। সে এসে বিশ্বেশ্বরকে সোজাসুজি বলল, এবার তো বাড়ির অংশটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে মশাই।

বিশ্বেশ্বর জলজল করে ইব্রাহিমের লম্বাপানা মুখটার দিকে চেয়ে বিগলিত হাসি হেসে বললেন, রহিম আমার সহোদর ভাইয়ের মতো ছিল।

আজ্ঞে। তিনি তো আর নেই। অপোগণ্ড সব বাচ্চাকাচ্চা রেখে গেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে। আমরা এ বাড়িতে এসে উঠব। ও বাড়ি বিক্রি হবে। আপনাকে এক মাস সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ব্যবস্থা দেখবেন।

বিশ্বেশ্বর সারাদিন বাইরের সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অভিভূতের মতো। বোধহয় জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভাবছিলেন।

রহিম শেখের মৃত্যুর পরও মাধব রোজই তার বাড়ি যেত। তার মুড়ি কদমা আর জুটত না। হানা মুখ ভেঙাত না। রহিমের ছেলেরাও আর তাকে বিশেষ আমল দিত না। তবে বুড়ান তাকে বলত, তোরা আমাদের সঙ্গে থাক।

মাধবের এ প্রস্তাবে অমত ছিল না। সে তখন কিশোর বয়স্ক। হানা তখন বয়সের টানে লকলকিয়ে উঠছে। তার একটা মোহ জন্মাচ্ছিল। বড় হয়ে সে মুসলমান হবে এবং হানাকে বিয়ে করবে।

ইব্রাহিম তাদের এক মাস সময় দিয়েছিল। কিন্তু রহিম শেখের বউ কুলজান বিবি অর্থাৎ মাধবের চাচী একদিন তাকে ডেকে বলল, তোরা কোথায়ই বা যাবি? আমি ভাইজানকে বলবখন আরো কিছুদিন সময় দিতে।

এ কথায় এত আনন্দ হয়েছিল মাধবের, তেমন আনন্দ তার সারাজীবনেও খুব বেশি হয়নি।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বা অচেনা পৃথিবীর দিকে পা বাড়াতে যে মাধবের বিশেষ ভয় ছিল তা নয়। অভাবের চিন্তাও তার মনে স্থান পায়নি। কিন্তু এই চেনা গ্রাম এবং চেনা পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে তার বুকটা খাঁ খাঁ করত।

বিশ্বেশ্বরের দুশ্চিন্তা ও শোক ছিল দেখার মতো। তিনি সকাল থেকে রাত অবধি কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন আর হা-হুতাশ করতেন। কখনো মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতেন চুপচাপ। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাতে উঠে শাবল নিয়ে বাড়ির এখানে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে উঠে মাধব তার বাবাকে আবিষ্কার করল দক্ষিণ দিকের দালানের নিচের এক কুঠরীতে। শাবল এবং কোদাল দিয়ে তিনি সেই ঘরের মেঝেতে হাত তিনেক গভীর এক গর্ত করে ফেলেছেন এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছেন।

অবাক হয়ে মাধব বলল, বাবা এ কী?

বিশ্বেশ্বর ঠোঁটে আঙুল তুলে চাপা গলায় বললেন, লুকোনো টাকা পয়সা খুঁজছি। চুপ!

মাধব খিক করে হেসে ফেলল।

বিশ্বেশ্বর হাঁফিয়ে পড়েছিলেন। মাটিমাখা হাতে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, চতুর্ভুজ মল্লিক খুব কৃপণ ছিলেন। মেলা টাকা ছিল তাঁর। যখ হয়ে আজও পাহারা দিচ্ছেন, বুঝলি!

মাধব চতুর্ভুজ মল্লিকের কথা শুনেছে। তার দাদুর দাদু। চতুর্ভুজ মল্লিক যে টাকা লুকিয়ে রাখত এ গল্প বহুল প্রচারিত। তাই অবিশ্বাস তো হলই না

বরং তার রক্ত নাচতে লাগল উত্তেজনায়। শাবল নিয়ে সে গর্তে লাফিয়ে নামল।

এর পর কয়েকটা দিন বাপ-ব্যাটায় মিলে নিচের তলার ঘরগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। একেবারেই যে কিছু পাওয়া গেল না তা নয়। পর্বদিকের একটা চোবকুঠরীর মেঝের নিচে বাস্তবিকই একটা বাঁধানো খোপ ছিল। অনেকটা চৌবাচ্চার মতো। তার মধ্যে একটা কাঠের বাক্সে রামায়ণের একটা হাতে লেখা পুঁথির কিছু ঝুরঝুরে পাতা আর একটা পিতলের পিলসুজ পাওয়া গেল।

গুপ্তধন পাওয়া না গেলেও নেশাটা ছিল মারাত্মক। পাওয়া যাবে—এই আশায় অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো জোর এসে যেত গায়ে।

কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি এত বেশি মাত্রায় হয়েছিল যে একদিন ইব্রাহিমের চোখে পড়ে যায়। খুব হম্বিতম্বি করল ইব্রাহিম, ই কী কথা! বাড়িটাকে যে একেবারে খাল বানিয়ে ফেললেন, অ্যা! ব্যাপারখানা কী বলুন তো!

ব্যাপারখানা যে কী তা তো আর ইব্রাহিমকে বলা যায় না। বিশ্বেশ্বর অপরাধী মুখ করে চুপ থাকলো।

ইব্রাহিম পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে মহা সোরগোল তুলে ফেলল। বিশ্বেশ্বর যে ইচ্ছে করেই বাড়ি জখম করে তাদের জব্দ করার চেষ্টা করছে সেটা প্রমাণ হয়ে যেতে দেরী হল না। রহিম শেখের বড় ছেলে গুডানও মামার পক্ষ নিল। এবাড়ি তাদের, এর কোনো ক্ষতি করার হক বিশ্বেশ্বরের নেই। তাঁরা যেন একমাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

আর থাকা এমনিতেও সম্ভব ছিল না। কারণ রহিম শেখের মৃত্যুর পর সামান্য খুদকুড়োর যোগানেও টান পড়ছিল। গ্রামে পড়ে থাকলে ভিক্ষামাত্র সার হবে। তার ওপর ভদ্রাসনই যখন অন্যের দখলে তখন আর থাকা যায় কীভাবে?

সুতরাং শীতকালের এক ভোরবেলা তিনটি প্রাণী বেরিয়ে পড়ল। তিনজনেরই মাথায় বা বগলে বাক্স-প্যাটিরা এবং পুঁটুলি। মূল্যবান কিছু নয়, সামান্য তৈজস। তাদের লক্ষ্যস্থল বর্ধমানে রহিম শেখের গ্রাম। সেখানে রহিম শেখের বাড়ি এবং জমিজমা সর্বেশ্বরের দখলে। সুতরাং সেখানে গেলে সর্বেশ্বরের একটা খোঁজ পাওয়া যাবেই। আর তার খোঁজ পাওয়া গেলে আশ্রয়ও জুটে যাবে।

কিন্তু বাস্তবত ঘটনা সেরকম ঘটল না। ট্রেনে বা স্টিমারে উঠতে হলে টিকিট লাগে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কাছে টিকিট কেনার মতো টাকা ছিল না।

সুতরাং বিনা টিকিটে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েই তাদের ধরা পড়তে হল। বিস্তর নাকানি চোবানি খেয়ে ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু গোটা অচেনা দুনিয়াটাই তাঁর কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল।

মাধবও বুঝতে পারছিল, দুনিয়াটা বেশ কঠিন ঠাঁই। তবে কিনা কাঠিন্যের সঙ্গে তার পরিচয় আজন্ম। কাজেই বারবার গলাধাক্কা খেয়ে এ-গাড়ি থেকে নেমে, ও-গাড়িতে উঠে, প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়ে, কলের জল খেয়ে পেট ভরিয়েও সে এই প্রথম ভ্রমণের আস্বাদ বেশ পাচ্ছিল। ঘটনা ঘটছে, নতুন মানুষ দেখা যাচ্ছে, ট্রেনে বা স্টিমারে চাপছে, আনন্দ কি কিছু কম?

গ্রাম ছেড়ে বেরোবার দশ দিনের মাথায় তারা বর্ধমানে পৌঁছোলো। তিনজনেরই প্রাণ তখন কণ্ঠায় ঠেকে আছে।

একটা সুবিধে অবশ্য ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। পথে বিপাকে পড়ে তারা তিনজনেই ভিক্ষে করতে শিখে যায়। তার মানে এ নয় যে ভিক্ষা সুলভ। কিন্তু আড় ভাঙা বলেও তো একটা কথা আছে। ভদ্রঘরের লোকের পক্ষে, বিশেষত বিশ্বেশ্বরের মতো শিক্ষিত লোকের ভিক্ষে করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

বর্ধমান স্টেশনে তিনজনে যখন লাতন হয়ে বসে আছে, ভবিষ্যৎবিহীন এক অন্ধকারে, তখন মাধব হঠাৎ তার বাবাকে বলল, গান গাইলে হয় না বাবা?

গান! গান কিসের?

গান গাইলে লোকে শোনে। পয়সা দেয়।

বিশ্বেশ্বর যে একসময়ে গান গাইতেন এটা তাঁর মনেও ছিল না। চর্চার অভাবে গলা বসে গেছে, দমেও টান পড়েছে। কিন্তু পয়সার আশায় মানুষ কী না করতে পারে? বিশ্বেশ্বর গান ধরলেন। ছোটখাটো ভীড়ও জমে গেল।

পয়সা যে তেমন কিছু পড়ল তা নয়। তবে সেই বেলাটা দিব্যি ভাত জুটে গেল তিনজনের। ভিনদেশে পা দিয়ে এই প্রথম পারিশ্রমিক উপার্জন করলেন তিনি।

রহিম শেখের বাড়ির গাঁয়ে পৌঁছোতে তাদের আরো দিন দুই লাগল। বর্ধমান স্টেশন থেকে রহিমের গ্রাম বেশী দূরে নয়। মাত্র মাইল পাঁচ ছয় রাস্তা। তবু সময় লাগল সাহস সঞ্চয় করতে। সেখানে যে আশ্রয় জুটবে এমন আশা আর তাদের বিশেষ কিছু ছিল না। তবু চেষ্টার শেষ রাখতে নেই বলে যাওয়া।

যাকে মাটিকোঠা বলে রহিম শেখের বাড়ি হল এটি। তবে তার একটা বেশ সম্পন্ন চেহারা আছে। মাটির দেওয়ালগুলি মসৃণ, উঠোন দাওয়া সব নিকোনো। বাড়িটাও তো বড়ই। উঠোন ঘিরে দুটো দোতলা আর একটা একতলা মেটে ঘর। ধানের গোলা, গোয়াল সবই আছে।

বিশ্বেশ্বর মেজদাকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। বউদিকেও ডাকলেন। একতলা ঘরটা থেকে এক আধবয়সী বউ বেরিয়ে এসে ভিখিরিপানা তিন মূর্তিকে দেখে বিরস মুখে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাইছো? এখন কিছু হবে না।

বিশ্বেশ্বর চটে উঠে বললেন, এ আমার দাদার বাড়ি।

তোমার দাদা?

আমার দাদা সর্বেশ্বর মল্লিক।

বউটা জিব কেটে ভিতরে ঢুকে গেল। এবার বেরোলো এক মাঝবয়সী রোগাভোগা চেহারার লোক। তার লম্বা কালো কুচকুচে দাড়ি, বাবরি চুল, পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। কপালে সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা। তবে চোখের নজরটা তেমন কঠিন নয়। একটু নরম।

সর্বেশ্বরবাবুর ভাই? কই তাঁর তো ভাই আছে বলে শুনিনি!

আমরা সব দেশের বাড়িতে ছিলাম। এই আসছি।

কিন্তু বাবু তো কিছু বলে যাননি আমাদের।

তিনি কোথায়? বিশ্বেশ্বর ধমকে ওঠেন।

তিনি এখানে থাকেন না, কলকাতায় থাকেন।

তবে এ-বাড়িতে কে থাকে? তাঁর বউ বাচ্চা নেই এখানে?

আজ্ঞে না। তাঁরা সব কলকাতায়। এখানে আমি থাকি, পাহারা দিই, গরু দেখি। চাষবাসও দেখতে হয়।

বিশ্বেশ্বর দমে গেলেও তেজের গলাতেই বললেন, ওহে শোনো, এই সন্ধেবেলা আমরা সব ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছি, এখন তো আর কলকাতায় ছুটতে পারি না। ঠিকানাও জানি না কেউ। আর জানলেও সেই শহরে নতুন গিয়ে বাসা খুঁজে বের করা আমাদের কম্ম নয়। একখানা ঘর খুলে দাও, একটু মাথা গুঁজি আপাতত।

লোকটা বারবার চোখ দিয়ে তাদের জরিপ করার চেষ্টা করছিল আর দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, দেখুন, একটা কথা আছে। বাবু বলে দিয়েছে, কেউ খোঁজ-খবর করতে এলে যেন কিছু না বলি। তার তো শত্তুরের অভাব নেই।

বিশ্বেশ্বর বললেন, শত্রু ? শত্রু কিসের ? এবাড়িতে আমারও হিস্যা আছে। আমার বাপের সম্পত্তির সঙ্গে রহিম শেখের সম্পত্তি পাল্টাপাল্টি করা হয়েছে। ইয়ার্কি পেয়েছো ?

বিশ্বেশ্বর ভীতু মানুষ বটে, কিন্তু পথশ্রম, ক্লান্তি, হতাশা এবং অনিশ্চয়তা থেকে তাঁর একটা মরীয়া ভাব এসে গিয়েছিল।

লোকটা কী বুঝল কে জানে। নরম গলাতেই বলল, এসে যখন পড়েছেন তখন থাকুন দুটো দিন। শনিবার তাঁর আসার কথা আছে। এলে মোকাবিলা করে নেবেন। রহিম শেখকে কি আপনি চেনেন ?

ভাল চিনি। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে ছিল আমার মাথার ওপর ছাতার মতো। সে চলে গিয়ে ইস্তক হাঁড়ির হাল।

লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, রহিম কি বেঁচে নেই ?

না। তাকে সাপে কামড়েছিল। মরে গেছে।

লোকটা স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর দুঃখিতভাবে মাথাটা একটু নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বার বার বলেছিলুম পাকিস্তানে যেয়ো না। তোমার নিয়তি ওত পেতে আছে এখানে। কথা শুনল না। এইটুকু বেলা থেকে চেনাজানা, বড় ভাল লোক।

লোকটা দোতলা কোঠার নিচের তলার একখানা ঘর খুলে দিল।

প্রাসাদোপম যে বাড়িতে মাধবের জন্ম হয়েছে সেই বাড়ির তুলনায় এই মাঠকোঠা কিছুই নয়, তবু দীর্ঘ পথশ্রম, ভয় ও অনিশ্চয়তার পর ঘরের খোলা দরজাটা যেন মায়ের কোলে ডাক দিয়েছিল তাকে। তাজমহল কি এর চেয়ে ভাল ?

কিন্তু মুস্কিল বাধল শনিবার। সকালের দিকেই একটা অচেনা লোক এসে হাজির। চেহারায় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল। কাঁচা-পাকা চুল, মোটা গোঁফ পরনে ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখমুখ অত্যন্ত ধূর্ত। দেখেই মাধব বুঝতে পারল, এ সেই মেজো জ্যাঠামশাই সর্বেশ্বর। এঁকে সে জ্ঞানবয়সে দেখেনি।

সর্বেশ্বর শুরুটাই করলেন গলার স্বরে বজ্রপাতের শব্দ তুলে, একী ! এরা কারা ? এরা এখানে কেন ?

নিজের সহোদর ভাইকে তাঁর না চেনার কথা নয়। মাধবের পিসিও তাঁর আপন দিদি। কিন্তু তিনি প্রথমেই একটা অপরিচয়ের অভিনয় শুরু করেছিলেন আতঙ্কে। আতঙ্ক হওয়ারই কথা। ধর্মত ন্যায্যত জয়ধ্বজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনি একা নন। বিনিময়ের মাধ্যমে পাওয়া সম্পত্তিও

তাই তাঁর একার হতে পারে না। সুতরাং ভাগীদার দেখে তিনি মাথার ঠিক রাখতে পারেননি।

বিশ্বেশ্বর উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। দাদাকে দেখে উঠে একটা প্রণাম করে বললেন, চিনতে পারছো না? দাঁড়াও, নাপিত ডেকে শেভটেভ করে হয়ে নিই। পথের যা ধকল গেছে বলার নয়। অনেক দিন দেখাও নেই।

কিন্তু সর্বেশ্বর এসব কথায় কান না দিয়ে উচ্চস্বরে "কানাই, কানাই" বলে ডাকতে লাগলেন। কানাই অর্থাৎ সেই দাড়ি আর বাবরিওলা লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ কান সজাগ রেখেছিল। ভালমানুষের মতো সামনে এসে দাঁড়াতেই সর্বেশ্বর তার ওপর ফেটে পড়লেন, এটা কি ধর্মশালা নাকি? এদের ঢুকতে দিয়েছে কে? অ্যাঁ! কোন সাহসে ঢুকল এখানে?

কানাই ঘাবড়াল না। বেশ মোলায়েম গলায় বলল, ইনি কি আপনার ভাই নন?

সর্বেশ্বর আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে চেঁচালেন, ও কথা থাক। আগে বল ঢুকতে দিলি কেন? আমি বারণ করেছিলাম কিনা তোকে যে কাউকে এবাড়িতে ঢুকতে দিবি না!

সে তো বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ইনি এসে বললেন যে আপনি এনার মায়ের পেটের দাদা। হয়রানও হয়ে পড়েছিলেন খুব। তা ভাবলাম সত্যিই যদি বাবুর ভাই-ই হয়ে থাকে তবে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। বাবু শুনলে রাগ করবে।

সর্বেশ্বর ভাই কথাটা একদম সহ্য করতে পারছিলেন না। ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, ফের ওসব কথা! ভাই আবার কিসের রে [illegible] কথা ওঠে কেন? বাড়ি আমার নামে, আমার নামে দলিল, আমার সম্পত্তি, এখানে উটকো লোক কেন মাথা গলাবে?

বিশ্বেশ্বর কেমন বেকুব বনে গেলেন এসব কথা শুনে। তাঁর মুখ দিয়ে কথা আসছিল না। শুধু জুলজুল করে চেয়ে ছিলেন দাদার দিকে। মাধবের পিসি রোগাভোগা লোক এবং চিরদিনই একটু চুপচাপ। তার মৃগী রোগের প্রকোপটা ইদানীং বেড়েছে। মাঝে মাঝেই ফিট হয়। মেজো ভাইয়ের অগ্নিমূর্তি দেখে সেও কেমন বাক্যহারা। কিন্তু মাধবের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্যরকম। মেজো জ্যাঠার এইসব কথাবার্তা শুনে তার হঠাৎ চোঁ চোঁ এক খিদে ধরে গেল পেটে। সম্ভবত সেটা ভাবী উপবাসের আগাম ইংগীত। জ্যাঠা তাড়িয়ে দিলে তাদের ফের পথে বেরোতে হবে এবং পথে বেরোলে আবার কলের জল বা ভিক্ষে। সম্ভবত এই চিন্তাটাই তার পেটের মধ্যে

একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে থাকবে। সে হঠাৎ দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে লাগল। ঠিক এরকমভাবেই সে দৌড়েছিল রহিম শেখের মৃত্যুর সময়ে। মাধব কোনোদিনই তার এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। ঘাবড়ে গেলে বা তীব্র শোকের কারণ ঘটলে তার ভিতরে এক ভয়ার্ত পলায়ন ছাড়া আর কোনো বোধ কাজ করে না।

দৌড়োতে দৌড়োতে সে যেখানে গিয়ে থামল সেটা একটা মস্ত উঠোন। সামনে একটা উদুখল আর বাছুর বাঁধা দড়ি। একটা খ্যানখ্যানে বুড়ি চড়া গলায় বলে উঠল, কে রে? কোন বাড়ির ছেলে তুই!

মাধব যে কোন বাড়ির ছেলে তা সে নিজেও জানে না। বাস্তবিক সে কি কোনো বাড়ির ছেলে? পৈতৃক বাড়ি বলে যেটাকে সে জানত তাদের সেই বজ্রযোগিনী গ্রামের বাড়ি তারা থাকতেই রহিম শেখের বাড়ি হয়ে যায়। সর্বেশ্বর জ্যাঠার বাড়িও যে তার বাড়ি নয় এটা সে শিশু হয়েও বুঝতে পারছে।

সে বুড়িটার কথার জবাব দিতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। মাথাটা কেমন ঘোলাটে।

বুড়িটা কুলোয় করে কিছু একটা ঝাড়ছিল উঠোনে বসে। এবার উঠে এগিয়ে এসে মাধবের মুখখানা ভাল করে দেখে বলল, এ বাবা! এ যে গ্যাদড়া নোংরা ছেলে গো! এই, কোথা থেকে আসছিস? অ্যাঁ! যাঃ যাঃ—।

মাধব বুড়িটার দিকে তাকাল। বুড়িরা যেমন হয় তেমনি। তবে এর রংটা বেশ ফর্সা। মুখটা রাগী-রাগী। মাধব বুঝল, বুড়ি লোক সুবিধের নয়। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভুল করে ঢুকে পড়েছি ঠাকুমা, যাচ্ছি।

যাঃ যাঃ! কী নোংরা বাবা! বাঙাল নাকি তুই?

মাধব মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, তারা বাঙাল।

বুড়ি বলল, বাব্বাঃ কী ভাষা-হাউ মাউ খাঁউ!

মাধব জানে তাদের ভাষা বুঝতে এদিককার লোকের অসুবিধে হয়। বাঙাল বলে সবাই নাক সিঁটকোয়। কিন্তু সে এ-ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। রহিম শেখ আর তার ছেলেরা একধরনের ভাষায় কথা বলত বটে, কিন্তু মাধব সেটা শেখেনি।

উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে সে ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটা ভাল করে দেখল। মস্ত পাকাবাড়ি। ঝকঝকে চেহারা। পিছন দিকে বাড়ির লাগোয়া একটা পুকুর আছে। বাইরের দিকটায় একতলা দালানে ওঠার চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির

দু' ধারে বাঁধানো রক। দুটো রকই বারান্দার মতো বড় আব চওড়া। একটা রক-এ একজন ফর্সাপানা লোক বসে আছে, তার সামনে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়ানো। খুব গভীর কোনো শলাপরামর্শ চলছিল।

কী নিশ্চিত, কী নির্বিঘ্ন এদের জীবন ! কী বডলোক ! এদের বাড়িতে কি তার বয়সী কোনো ছেলে নেই যার সঙ্গে ভাব পাতানো যায় ! ভাবতে ভাবতে বাড়িটার দিকে আর একবার ঈর্ষার চোখে চেয়ে মাধব ধীর পায়ে আবার তাব জ্যাঠার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল।

সর্বেশ্বর সারাটা দিন দোতলার ঘরে উঠে বসে রইলেন। নামলেন না, কাবো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। আলাদা উনুন জ্বেলে কানাইয়ের বউ তাঁর জন্য রান্না কবে ওপরে পৌঁছে দিয়ে এল। তাঁর নিজের দিদির রান্না পর্যন্ত তিনি খেলেন না। বিশ্বেশ্বরের মুখে একটা ভারী নির্বোধ ভাব সেঁটে রইল সারাদিন। তাঁর দিদিরও ভয় ভয় ভাবটা যাচ্ছিল না। কী হবে, কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিল না তারা।

দুপুরের দিকে কানাই তাদের ঘরে এসে চাপা স্বরে বলল, দেখলেন তো, আমি এই ভয়েই আপনাদের জায়গা দিতে চাইনি। লোক চিনি কিনা।

বিশ্বেশ্বর আকুল হয়ে বললেন, কিন্তু ভাই, আমি লোক খারাপ নই।

আপনার কথা বলছি না, আপনার দাদার কথা বলছি। উনি লোক সুবিধের নন।

কিন্তু আমরা এখন কী করব ? আমাদের সব সম্পত্তি দাদা রহিম শেখকে এই সম্পত্তির বিনিময়ে লিখে দিয়েছে।

সবই বুঝলাম। কিন্তু আমি তো একরকম ওনার কর্মচারী। আমার তো করার কিছু নেই।

তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলো।

আপনাদের তো উনি চিনতেই চাইছেন না।

কিন্তু আমি ওর সহোদর ভাই, বিশ্বাস করো। ইনি ওঁর আপন দিদি।

সে আমি বুঝেছি। কিন্তু সম্পর্কটা যদি উনি না রাখতে চান তাহলে কী করার আছে ?

বিশ্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। তাঁর দিদি, অর্থাৎ মাধবের পিসি বিনোদবালা অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে বললেন, আমরা সর্বেশ্বরের সম্পত্তির অংশ চাই না। শুধু ক'টা দিন থাকব। এই যে ছোটো ছেলেটা এর মা নেই। আমি বুকে করে এত বড়টি করেছি। সর্বেশ্বরের নিজের ভাইপো। এ ছেলেটা পথে কত কষ্ট পেয়েছে। এসব কথা

আমিই না হয় ওকে বুঝিয়ে বলিগে।

কানাই জিব কেটে দু' হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে, ও-কাজও করবেন না। বাবু এখন রেগে নিজের চুল নিজে ছিঁড়ছেন। তাছাড়া ঝাড়ুনী বুড়িকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেও এল বলে।

বিনোদবালা অবাক হয়ে বলে, সে আবার কে ?

এলেই বুঝবেন। দারুণ ঝগড়াটে এক মাগী। মুখ যেন আস্তাকুঁড়। তার অনেক ব্যবসার মধ্যে একটা হল ঝগড়া করে বেড়ানো। চার কাটা চাল আর পাঁচসিকে পয়সা পেলে যে কারও হয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে আসে। সে দারুণ ঝগড়া। কানে আঙুল দিতে হয়।

ও বাবা ! এবকমও হয় নাকি ?

আরো আছে। এখানকার এম এল এ মশাই গতকালই গাঁয়ে ফিরেছেন। বাবু তাঁর কাছেও খবর দিয়েছেন। সন্ধ্যেবেলা তিনিও আসবেন ব্যাপার দেখতে। তাঁর পার্টিতে বাবু টাকা দেন তো।

বিনোদবালা আর বিশ্বেশ্বর এত অবাক হলেন যে কিছুক্ষণ তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। শেষে বিনোদবালা বললেন, আমাদের তাড়াতে এত ব্যবস্থা ! বলো কি কানাই। আমরা যে ছারপোকার অধম মানুষ। সর্বেশ্বর মশা মারতে যে কামান দাগছে।

আমার তো দোষ নেই মাঠাকরুণ। বাবু যেমন হুকুম করেছেন তেমনই করেছি। তাও আপনারা টিকতে পারবেন না।

বেলা ভাল করে পড়বার আগেই সর্বেশ্বর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় নিচে নামলেন এবং কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে এবং কারো সঙ্গে একটিও কথা না বলে চলে গেলেন। তাঁর মুখ থমথম করছিল।

সর্বেশ্বর চলে যাওয়ার আধঘণ্টা বাদেই যে ঘটনাটি ঘটল তা মাধবের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। মজারও বটে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই হঠাৎ উঠোনের পশ্চিম দিকের আগড় ঠেলে তিনটি মেয়েমানুষ এসে ঢুকল। একজন বয়স্কা, থলথলে চেহারা, পরনে থান। আর দুজনের বয়স কম, তবে চেহারা বেশ মজবুত এবং কাটখোট্টা ধরনের। তিনজনেরই চোখ গোল এবং মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন।

উঠোনে পা দিয়েই বয়স্কা মহিলা হঠাৎ একটা বাজখাঁই হাঁক দিলেন, কোথায় রে গু-খেগোর ব্যাটাবেটিরা, আয় তো সামনে ভাতারখাগী মাগখেগো ষাঁড় আর বদমাশ ! আয় সামনে, ঝেঁটিয়ে আজ যমের বাড়ি পাঠাই····

সেই অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালাগালের কোনো কূলকিনারা নেই। মানুষের

ভাষা যে এরকম কুৎসিত হতে পারে তা বিশ্বেশ্বর বা বিনোদবালার ধারণা ছিল না। তাঁরা দাওয়া থেকে কোনোরকমে ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন ভয়ে। ঝাড়ুনী দাওয়ায় উঠে তার কেঁদো পা দিয়ে দরজায় দমাদম লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ফেলল। বিস্তর লোক জমে গেল উঠোনের চারপাশে। লোক দেখে ঝাড়ুনীর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গেল। কখনো নেচে, কখনো লাফিয়ে, গলার স্বর নানা রকম করে কত যে বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই।

মাধব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরোটা খুব মন দিয়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে খিক খিক করে হেসেও ফেলছিল সে। ওপর থেকেই সে দেখতে পেল ঝাড়ুনী একনাগাড়ে ঘন্টাখানেক বকার পর থেমে মেয়ে দুটোর একটিকে চাপা স্বরে বলল, পুঁটি ধর না রে। একটা পান মুখে দিয়ে নিই।

অমনি পুঁটি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, ওরে ও শালা-শালীরা, হেগো পোঁদ ঘষে দিই তোদের মুখে·

মাধব খুব হাসতে লাগল শুনে। পুঁটি এক-আধবার কী একটু ভুল করে ফেলতেই ঝাড়ুনী ধমক দিয়ে বলে উঠল, ও কী' ঠিক করে বল। বারভাতারী নয়, বারোভাতারী। কুট নয়,বল কুঠ হবে, কুঠ হবে। আর পা দাপানো বন্ধ হচ্ছে কেন রে বারবার। কবে শিখবি এসব ? আমি মলে ?

মাধব বুঝল, ঝাড়ুনী আসলে একজন শিল্পী। দুটো মেয়ে হচ্ছে তার ছাত্রী।

ওরকম কতক্ষণ চলত তা বলা মুস্কিল। তবে সন্ধ্যে যখন ঘোরালো হয়ে এসেছে সেই সময়ে ভীড়ের ভিতর একটু গুঞ্জন উঠল আর ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। মাধব দেখল, ভীড় সরিয়ে সেই বকে-বসা ফর্সা লোকটা আসছে। সঙ্গে পাঁচ-সাত জন লোক। কানাই শশব্যস্তে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তার বউ কয়েকটা মোড়া পেতে দিল উঠোনে। ঝাড়ুনী আর তার দুই শিষ্যা লোকটাকে দেখেই তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কোথায়।

লোকটা কানাইকে বলল, ওঁরা এখনো আছেন ?

আজ্ঞে ঘরে দোর দিয়ে আছেন।

ডাক ডাক শিগগির। আমার সময় নেই। আজ রাতের গাড়ি ধরতে হবে। কাল অ্যাসেমব্লি।

লোকটা যে মাতব্বর তা বুঝতে মাধবের দেরী হল না।

কানাই গিয়ে রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে বলল, ও দাদাবাবু, মাঠাকুরান, বেরিয়ে

আসুন। এম এল এ মশাই এসেছেন। আমাদের কেশব মিত্তির মশাই গো।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করাব পর দরজা খুলে বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে এলেন। চোখেমুখে গভীর ভয় এবং দিশাহারা ভাবটা কানাইয়ের হ্যারিকেনেব আলোতেও বোঝা গেল।

কেশব মিত্র খুবই বুদ্ধিমান লোক। মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা না দিয়ে মিষ্টি করেই বললেন, আপনারা সব কোথা থেকে আসছেন!

আজ্ঞে দেশের গ্রাম থেকে। বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী।

কেশব মিত্র মাথা নেড়ে বললেন, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে বলা নেই কওয়া নেই দখল নিতে চাইছেন কেন?

দখল! বলে বিশ্বেশ্বর টালুমালু করে চাবদিকে চেয়ে দেখে বললেন, দখল তো নয়। একটু আশ্রয।

আশ্রয় তো অন্য জায়গাতেও আছে। সরকাব উদ্বাস্তুদের জন্য অনেক রকম **স্কিম** করেছেন। সেখানে যান। খামোখা এক গেরস্তর ঘরে এরকম হামলা কবা তো ঠিক নয়।

ইনি আমার দাদা। আপন সহোদর ভাই।

কোনো প্রমাণ আছে?

এ কথায় বিশ্বেশ্বর সাত হাত জলের তলায় পড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বইলেন। তারপর বললেন, না। প্রমাণ কী থাকবে! এক মায়ের পেটে জন্মেছিলাম, এইমাত্র।

কেশব মিত্র ভ্রূ কুঁচকে বললেন, সে হলেও বলি, দাদার রক্ত-জল-করা বাড়ি-ঘর দখল কবাব রাইট তো ভাইয়েরও থাকে না।

দখল করিনি তো!

কিন্তু পজিশন তো নিয়ে ফেলেছেন। আইনে সেটাও মস্ত পয়েন্ট। শেষ অবধি যদি দাবি তোলেন তখন কী হবে?

দাবি তুলব না। শুধু কয়েকটা দিন থাকব। আমরা বড় হয়রান হয়ে এসেছি। জিরোনো দরকার।

কেশব মিত্র রাগলেন না। তবে কঠোব হয়ে বললেন, সর্বেশ্বরবাবুকে আমি বহুদিন চিনি। ভাল লোক। শুনেছি দেশের বাড়িতে ভাইরা তাঁকে থাকতে দেয়নি। বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন যদি তিনি ভাইদের আশ্রয় দিতে না চান তবে আমি তার দোষ দেখি না।

বিশ্বেশ্বর অনেক কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁব নার্ভ এ সময়ে ফেল করে। তিনি হঠাৎ দাওয়ায় বসে পড়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিনোদবালা মূর্ছা গেলেন ঘরের মধ্যে।

কেশব মিত্র যা বুঝবার বুঝে নিয়েছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। কয়েকটা দিন বরং বিশ্রাম নিন। আমি সর্বেশ্বরবাবুকে বলে রাজি করাব। তবে স্থায়ীভাবে এখানে থাকার পরিকল্পনা করবেন না। তাতে ফল ভাল হবে না।

এই বলে সদলবলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ভীড়টাও আস্তে আস্তে সরে গেল।

সেই রাত্রে আর রান্না করার মতো শক্তি ছিল না বিনোদবালাব। জ্ঞান ফিরে আসার পব শয্যা নিতে হল। বিশ্বেশ্বর দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কানাই এক ধামা মুড়ি আর একটা বাটিতে খানিকটা ঝিঙে পোস্ত দিয়ে গেল. কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা সমেত।

মাধব সেই প্রথম তবকারি দিয়ে মুড়ি খায়। তার খারাপ লাগেনি। আসলে সেই বয়সে তার কোনো খাবারই খারাপ লাগত না। খাবার জিনিস হলেই হল।

পর দিন মাধব কানাইকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কানাইদা. এম এল এ কাকে বলে ?

ও বাবা ! হাতে মাথা কাটে। ওরাই তো আইন বানায়। দেশ চালায় ?

কেশব মিত্র কি খুব বড়লোক ?

বিরাট অবস্থা। নামে বেনামে কত জমি ! আগে বিশালাক্ষী পুজোয় ওদের বাড়ি নরবলি হত। খুব জাগ্রত দেবতা।

নরবলি ?

হ্যাঁ গো. নিজের চোখে দেখা।

এখনো হয় ?

না। বন্ধ হয়ে গেছে। মেলা ঝক্কি তো। তেমন বাচ্চা ছেলে পাওয়াও যায় না আজকাল।

বাচ্চা ছেলে বলি দেওয়া হত নাকি ?

তবে ! তিন থেকে পাঁচের মধ্যে বয়স হবে. নধরকান্তি হবে, খুঁত থাকলে চলবে না। মেলা বায়নাক্কা। হবি পাড়ুই নামে একটা লোক ছিল, সেই গিয়ে ভিন গাঁ থেকে দেখেশুনে ছেলে তুলে আনত।

মাধবের মুখ শুকিয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এখন আনে না ?

হরি মরে গেছে বছর কতক হল। ছেলেধরা বলে এমন পেটাল নীলপুরের

লোকেলা, বেচারা রক্তবমি করতে করতে মরে গেল। সেই থেকে নরবলি বন্ধ। তবে এখনও পুতুল গড়ে বলি হয়।

কেশব মিত্র কি খুব রাগী?

রাগী বটে তবে মানী মানুষ। খামোখা চটেন না।

আমাদের ওপর কি রাগ আছে?

তা আছে বলতে পারো। কাজটা তোমরা ভাল করোনি। তবে কেশববাবু অবিবেচক নন। দেশের নেতা তো বটে। আমরা সব তাঁরই তো প্রজা। তিনি অনেকটা আমাদের বাপের মতো। যদি তোমার বাপ গিয়ে জুৎমতো ধরেন ওঁকে, তবে একটা হিল্লে করেই দেবেন।

বাবার যে মাথার ঠিক নেই।

গুতোর চোটে ঠিক হয়ে যাবে। বাবু তো আজ ভালয় ভালয় বিদেয় হলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পরের শনিবার বাবু গিন্নিমাকেও সঙ্গে আনবেন। তিনি এলেই সব চিৎপটাং।

জ্যাঠিমা কি খুব রাগী?

সাক্ষাৎ কাঁচাখেগো।

কাঁচাখেগো কী?

এলেই বুঝবে। কলির তো সবে সন্ধে। তবে বলে দিচ্ছি, বাবু আর গিন্নি এক হয়ে তোমাদের তিষ্ঠোতে দেবে না। বাবু পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন দালান তুলবে কি মাগনা?

দেবে না যে তা মাধবও জানে। জ্যাঠাজ্যেঠি সম্পর্কে তার কোনো মোহ নেই। জন্মাবধি সে তার কোনো আত্মীয়স্বজন তেমন দেখেনি বললেই হয়। তবে জ্যাঠার এই বাড়িটা তার খুব ভাল লেগে গেছে। দালান-কোঠা নয় বটে, কিন্তু ভারী গেঁয়ো ভারী আপন একটা ভাব আছে বাড়িটার মধ্যে। বেশ একখানা সবুজ ক্ষেত আছে পুবের দিকে। তার চারধারে মেলা গাছগাছালি। ভারী ঠাণ্ডা আর গভীর একটা মমতায় মাখানো। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এই বাড়িতেই রহিম চাচা থাকত, চাচী থাকত, গুডান জুড়ান বুড়ান হানা সব এ বাড়িতে জন্মেছে। ভাবতেই যেন মনে হয়, ওদের দেখতে পাবে যে কোনো সময়ে। রহিম চাচা বুঝি মাঠে চাষ করতে গেছে, চাচী রান্নাঘরে তার বিখ্যাত চুনো মাছের ছালুন রাঁধছে, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে আছে হানা, উঠোনে ছোটাছুটি করে খেলছে বুড়ান আর জুড়ান। গুড়ান গম্ভীর মুখে দাওয়ায় বই খুলে বসে আছে।

গরুটা আদুরে স্বরে হাঁক দিল, হাম্বা।

ভারী ঠাণ্ডা গরু। চোখ দুটো মায়ায় মাখানো। বোধহয় এটা রহিম চাচারই গরু। নইলে এই ঠাণ্ডা স্বভাব হয়।

কথাটা সে কানাইকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, এ গরুটা কি রহিম চাচার ?

কানাই মাথা নেড়ে বলে, রহিম যখন গেল তখন এটা ছিল বাছুর। এখন বড় হয়েছে।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে রহিম চাচার মতো এমন আপন একটা মানুষ সে আর দেখেনি। তার গরুটাকেও মাধবের আপনজন বলে মনে হতে লাগল।

জ্যাঠা আর জ্যেঠি এসে তাদের এ বাড়ি থেকে তাড়াবে। তবে তার এখনো এক সপ্তাহ দেরি আছে। তাই দুশ্চিন্তাটা মাধবের মাথায় বেশীক্ষণ রইল না। সে সকালবেলায় ঘুরে ঘুরে নতুন করে বাড়িটা দেখতে লাগল। দেখার অবশ্য বেশী কিছু নেই। ওপরের একটা ঘরে তক্তপোষে বিছানা পাতা। জ্যাঠামশাইরা এলে এখানে শোন। টেবিল চেয়ারও আছে কয়েকটা। অন্য ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা। পশ্চিম ধারের জমিতে নতুন ইঁটের মস্ত দুটো পাঁজা, তার পাশে বালি আর কুঁচো ইঁট পাথরের দুটো ঢিবি। নিচের একটা ঘরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট থাক করে সাজানো। জ্যাঠামশাই রহিম চাচার পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন দালান তুলবেন বলে প্রস্তুতি চলছে। মাধবের ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। রহিম চাচার পুরোনো বাড়ি ভেঙে জ্যাঠামশাই যখন দালান তুলবে তখন আর বাড়িটাকে তার আপন বলে মনে হবে না।

পশ্চিমের ঘরের একটা কুলুঙ্গিতে কয়েকটা আশ্চর্য জিনিস পেল মাধব। কয়েকটা কড়ি, এক জোড়া পেতলের মার্কড়ি আর ভাঙা কাচের চুড়ির কয়েকটা টুকরো। অবশ্যই হানার। জিনিসগুলো শুঁকে সে হানার গায়ের গন্ধ পেল। তারপর চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। সেই বজ্রযোগিনী গ্রাম, হানা, মুড়ি-কদমা, ভালবাসা।

জিনিসগুলো সে যত্ন করে রেখে দিল নিজের কাছে। যদি কখনো হানার সঙ্গে দেখা হয় তো দেবে।

বর্ধমান শহরের কাছে বলেই বোধহয় গঙ্গানগর গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। পাকা দোকানপাট আছে, রোজ বাজার বসে, বেশ কিছু বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে, গাঁয়ের মধ্যে কয়েকটা পাকা রাস্তাও আছে। একটা মেয়েদের আর একটা ছেলেদের ইস্কুল, লাইব্রেরি, ক্লাব, বসতি বেশ ঘন। সারাদিন কাজ নেই বলে মাধব ঘুরে ঘুরে দেখে। বজ্রযোগিনীর সৌন্দর্য ছিল অন্য রকম।

গঙ্গানগরের সেরকম নয়। তবে এ গ্রামটাও বেশ ভাল লেগে যায় মাধবের। খুব পুরোনো একটা কালীবাড়ি আছে। চারদিকে বট অশ্বত্থের জড়ামড়ি, তার ঘন ঘুটঘুট্টি ছায়ার নিচে ঠাণ্ডা পাথরের মন্দির। বেশী বড় নয়, কিন্তু সুন্দর কারুকাজ করা গা। আর আছে রাঘব সিংহের গড়। সেটা এক বড়সড় ধ্বংসস্তূপ। এসব দেখে মাধব আর ঘুরে ফিরে বার বার কেশব মিত্রের বাড়ির কাছে চলে আসে। তাব অপরিণত মন বলে, কেশব মিত্রের মতো ক্ষমতাবান এবং বড়লোকই পারে তাদের সব বিপদ কাটিয়ে দিতে। যদি এ বাড়ির কোনো অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে ভাব করা যায়? নেই কি কেউ তেমন?

তিন চার দিন ঘোরাঘুরিব পর এক দুপুরে ফের এসে মিত্রবাড়ির নাটমন্দিরেব সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধব। মস্ত বাড়ি। জানালা দরজা বেশীর ভাগই বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়িতে বেশী লোক থাকে না। একজন মাঝবয়সী বিধবা মেয়েমানুষ নাটমন্দির ঝাঁট দিচ্ছিল।

তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে একটু ভয় ভয় করল মাধবের। তাই সে গুটি গুটি গিয়ে নাটমন্দিরের একটা কোণায় বসল। বেশ বড় বাঁধানো তকতকে মেঝে, ওপরে টিনের আটচালা।

মেয়েমানুষটা তাকে টেরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, এই, কোন বাড়ির ছেলে রে তুই? কী জাত?

আমরা! একটু থতমত খেয়ে মাধব বলে, আমরা কায়স্থ! সর্বেশ্বর মল্লিক আমার জ্যাঠামশাই হন।

বাঙালদের বাড়িব ছেলে? হুঁ, তোদের কি আর জাতধর্ম আছে রে! বামুন কায়েত বাগ্‌দী সব একাকাব। ডিমসুতো দিয়ে পৈতে বানিয়ে রাতারাতি কত বাঙাল বামুন হয়ে যাচ্ছে! নেমে বোস বাছা, আমি এখন মেঝে ধোয়াবো।

মাধব সঙ্গে সঙ্গে নেমে একটু দূরে মাটির ওপর বসল। মেয়েমানুষটি কুয়ো থেকে বালতিতে জল টেনে এনে মেঝে ধোযাতে লাগল। পরিশ্রম কম নয়।

মাধব এ বাড়ির যে-কারো সঙ্গে ভাব কবার জন্য আঁকুমাকু করছিল ভিতরে ভিতরে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে গলাব স্বর একটু তুলে বলল, আমি জল টেনে দেবো পিসিমা?

মেয়েমানুষটা একবার সন্দিহান চোখে তার দিকে চেয়ে দেখে বলল, পয়সা পাবি না কিন্তু!

না, পয়সা লাগবে না। আপনার কষ্ট হচ্ছে তাই বলছিলাম।

কষ্ট বলে কষ্ট ! পাম্পটা চালালেই বকবক করে জল উঠে আসে, কিন্তু তাই কি চালাবে বুড়ি ' হুঁ, কেশব মিত্রের মা না ! পিঁপড়ের পোঁদ টিপে গুড় বের করে। তা যা. তুলবি তো দে তুলে কয়েক বালতি।

মাধব ছুটে গিয়ে জল তুলতে লাগল। বয়সের তুলনায় সে দীর্ঘকায় এবং অভাব অনটন উপবাস সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বেশ শক্তপোক্ত ছেলে। কয়েক বালতি জল টেনে দিতে তার গায়ে লাগল না।

মেয়েমানুষটা খুশি হয়ে বলল, সন্ধের পর আসিস। কালীকেত্তন হবে। ভোগ হবে। প্রসাদ পেয়ে যাবি।

মাধব মাথা নাড়ল। তবে বেশী উৎসাহ বোধ করল না। প্রসাদের ব্যাপারটায় তার সন্দেহ আছে। অনেক জায়গাতেই সে দেখেছে, অচেনা বাচ্চাকাচ্চাদের একটু বাতাসা দিয়ে বিদেয় দেওয়া হয়। আসল প্রসাদ থাকে বড়দের জন্য।

সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, এ বাড়িতে আমার মতো বয়সের কোনো ছেলে নেই ?

কেন রে ?

এমনি। বন্ধু পাতাবো।

ও বাব্বা ! বন্ধু পাতাবি ? তা এ বাড়ির ছেলে তোর সঙ্গে বন্ধু পাতাতে যাবে কেন ? তারা সব কলকাতার সাহেবী কেতার ইস্কুলে পড়ে। গটগট করে হাঁটে; কী সব চলন বলন ! তুই তাদের বন্ধু হবি কী রে ?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। মাধব বুঝল।

মেয়েমানুষটা ফের জিজ্ঞেস করল, সর্বেশ্বর তোর কে হয় বললি ?

জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই ? বলে ফের সেই সন্দিহান দৃষ্টি, তা তোর এই দশা কেন ? তার তো শুনি মেলা টাকাপয়সা। দালান কোঠা তুলবে শিগগির। তার ভাইপো হয়ে তোর এই ভিখিরিপানা চেহারা কেন ?

মাধব এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জবাব জানে না। তবু কিছু বলতে হয় বলে সে সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, জ্যাঠামশাই আমাদের দেখতে পারে না। শিগগির তাড়িয়ে দেবে।

বলিস কি ? আপন জ্যাঠা ?

একদম আপন।

তা তোরা যাবি কোথায় তাড়িয়ে দিলে ?

ঠিক নেই।

তাড়াবে কেন ?

আমরা সব হুট করে এসে পড়েছি তো, তাই।

বাঙালদেশে ছিলি বুঝি ?

হ্যাঁ। বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী।

আর কেউ নেই তোদের ?

আছে। দাদু আর বিলেতের জ্যাঠা ; তারা এসে পড়বে শিগগির। এলে আর কষ্ট থাকবে না। ফের বজ্রযোগিনীতে ফিরে যাবো।

ভিতরবাড়ি থেকে চিলের স্বরে একটা ডাক এল, ও কাদু-উ !

মেয়েমানুষটা চলে গেল তাড়াতাড়ি। মাধব চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ভাবতে লাগল। ভাবনার অবশ্য ছিলও মাধবের। কানাই সকালেই একখানা পোস্টকার্ড দেখিয়েছে বিশ্বেশ্বরকে, এই দেখুন, কলকাতা থেকে বাবুর চিঠি।

বিশ্বেশ্বর হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখেছে ?

লিখেছেন ঘরের চালডাল যেন আর আপনাদের দেওয়া না হয়। জোর করে বাড়িতে ঢুকেছেন বলে যেন পুলিশে একটা ডায়েরি করিয়ে রাখি। আর আপনারা যদি অন্য জায়গায় চলে যেতে রাজি থাকেন তবে যেন রাহাখরচ বাবদ পঞ্চাশটা টাকা আপনাদের দিয়ে দিই।

একথা শুনে বিশ্বেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন, সকাল থেকে। বিড় বিড় করছেন, পুলিশ ! পুলিশ আসবে ! পঞ্চাশ টাকা ! অ্যাঁ ! পঞ্চাশ টাকা !

মাধব পুলিশকে ভয় খায় না। তার সবচেয়ে বড় ভয় হল, চাল-ডাল বন্ধ হওয়া নিয়ে। তার মানে আজ রাত থেকে আর খাবার জুটছে না।

বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না বলে মাধব মিত্র-বাড়ির সামনের মাঠটায় চুপচাপ হাঁ করে বসে রইল। বিকেলের দিকে কয়েকটা ছেলে এসে তাকে সরিয়ে দিয়ে দুটো বাঁশ পুতে নেট টাঙিয়ে ভলিবল খেলতে শুরু করল। মাধব হাঁ করে সেই খেলা দেখল। সন্ধে হয়ে এল, সে তবু নড়ল না। কালী-কীর্তনের আসরে যখন লোক আসতে শুরু করল, নাটমন্দিরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো, তখন মাধব উঠে গিয়ে আসরের এক কোণে বসে পড়ল। গান-বাজনা যাই হোক একটা কিছু তো হবে। সময়টা কাটানো নিয়ে কথা। তার চেয়েও বড় কথা খিদেটাকে ভুলে থাকা যাবে কিছুক্ষণ।

ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে কেশব মিত্র যখন আসরে ঢুকলেন তখন তাঁর দু পাশে দুটি ভারী ভাল চেহারার ছেলে আর মেয়েকে দেখতে পেল মাধব। ছেলেটা তারই বয়সী। ফুটফুটে চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকের ছেলে। মেয়েটা কিছু ছোটো। সেও সুন্দরী বটে তবে রঙটা একটু চাপা।

আর ভারি দেমাকী চালচলন। একটা লাল টুকটুকে ফ্রক তার পরনে, কোমরে সোনালি রঙের জরির একটা পট্টি। ঘাড় অবধি চুল। চারদিকে চঞ্চল চোখে চাইছে আর দাদাকে কী যেন চাপা গলায় বলছে আর খিলখিল করে হাসছে। এ বয়সের মেয়েরা কারণে বা অকারণে খুব হাসে, এটা লক্ষ্য করেছে মাধব।

কেশববাবুর ছেলেটাকে সে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল। পরনে নীল রঙের একটা হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফহাতা শার্ট। খুব ফর্সা তার গায়ের রঙ। মুখখানা বেশ গম্ভীর। না, এরকম ছেলের সঙ্গে মাধবের বন্ধুত্ব হওয়ার নয়। তার মতো ছেলেরা এদের মতো বড়লোকের বাড়িতে চাকর খাটে। এরা তাকে পাত্তাই দেবে না। মাধব তৃষিতের মতো ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল।

মাধবের নিজের চেহারা কেমন তা সে আজও জানে না। এই বয়স অবধি সে কদাচিৎ আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে। চুল কাটার পয়সা জোটে না বলে প্রায়ই তার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে যায় এবং জট ধরে। মাথায় তেল শেষ করে দিয়েছে মনে পড়ে না। গায়ে সাবান মাখার ব্যাপারটা তার কাছে স্বপ্নের মতো। তার পরনে একটা বহুকালের পুরোনো দাঁড় বাঁধা প্যান্ট আর গায়ে একটা বগল ছেঁড়া মোটা গেঞ্জি, এ ছাড়া তার পোশাক বলতে কিছুই আর নেই। পুজো পার্বণেও তার নতুন জামা বা প্যান্ট জুটেছে বলে মনে পড়ে না। ছেলেটার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কথা ভাবতেই মাধবের ঘেন্না করল। তার হাতে পায়ে হাঁটুতে কত ক্ষত শুকিয়ে কালচে দাগ হয়ে আছে, দীর্ঘস্থায়ী পাঁচড়া দগদগে হয়ে থাকে হাতে পায়ে, বড় বড় নখের মধ্যে নীল ময়লা। গায়ে যে একটা চিলসে গন্ধ হয়েছে সেটা সে আজকাল নিজেও টের পায়। খুব উৎকট না হলে নিজের গায়ের বা মুখের গন্ধ মানুষ সাধারণত টের পায় না। সে পড়াশুনো করে না, তেমন খেলাধুলো জানে না। তার কোনো অহংকারও নেই। সে কাঙাল।

নিজের ওপর মাধবের সেদিন যে ঘেন্নাটা জন্মাল সেটাই হয়তো তার সামাজিক শ্রেণীচেতনার প্রাথমিক উন্মেষ। সেই শ্রেণীচৈতন্যের প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হল আশ্চর্য রকমের। সেদিন সে প্রসাদ নিল না। আসর শেষ হলে কেশববাবুর সুন্দর ছেলেটার দিকে জ্বালাভরা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল।

যথারীতি বাড়িতে রান্না হয়নি। তবে কানাই করুণা পরবশ কিছু মুড়ি দিয়ে গিয়েছিল। পিসি সেই মুড়ি যত্ন করে রেখেছিল তার জন্য। কানাই তাকে শিখিয়েছে, শুখা মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে খেলে ভাতের মতোই লাগে।

পূর্ববঙ্গে এরকম ভাবে মুড়ি খাওয়ার চলন নেই। মাধব তবু সেই রাত্রে জল ঢেলে মুড়ি মেখে খেল। কিছুই তার খারাপ লাগে না। ভেজা মুড়িও চমৎকার লাগল।

খেতে খেতে সে পিসিকে বলল, কেশববাবুর বাড়িতে কালীকীর্তন ছিল, বুঝলে ! গিয়েছিলাম।

প্রসাদ দিল ?

দিচ্ছিল। নিইনি।

কেন রে !

লজ্জা করল। ওরা এত বড়লোক।

খুব বড়লোক নাকি ?

খুব। ছেলেটা যা দারুণ দেখতে না ! সাহেবের মতো। কী পোশাক !

পিসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কত লোক কত সুখে আছে।

সেই রাত্রে মাধব অনেক স্বপ্ন দেখল। ভয়ের স্বপ্ন।

চার : জ্যাঠাইমার আগমন ও মাধবের বন্ধুলাভ

জ্যাঠাইমাকে মাধব কখনো দেখেনি। দেখলেও অতি শৈশবে। মনে নেই। সপ্তাহটা খুবই ভয়ে ভয়ে কাটছিল তাদের। কারণ প্রতিদিনই কানাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল, হুঁ হুঁ, আসছেন রোববার সকালে। দেখবে মজা! চেনো না তো গিন্নিমাকে ! ঝাড়ুনী পর্যন্ত তার কাছে ছেলেমানুষ।

কানাই রোজই সকালে একবার করে বিশ্বেশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়, চাল দেওয়া বন্ধ করতে বলে দিয়েছেন বাবু। এবার নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা দেখুন।

বিশ্বেশ্বর আর ব্যবস্থা কীই বা দেখবেন ! অচেনা জায়গায় ভিক্ষেমিক্ষে করেছেন বটে, কিন্তু এ হল তাঁর দাদার গাঁ। এখানে ভিক্ষে করলে বিচ্ছিরি সোরগোল হবে। কাজেই কানাইয়ের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

কিন্তু কানাই লোকটা কিছু অদ্ভুত ধরনের। মুখে তার অবিরল "না না" সত্ত্বেও সে কিন্তু রোজই চাল-ডালের একটা ব্যবস্থা করে দেয়। একটু বেলায় তার বউ ঘোমটা টেনে একটা ডালায় কিছু চাল, একটু ডাল আর সামান্য আনাজপাতি, ছোটো একটা মাটির ভাঁড়ে একটু তেল, এক খামচা নুন আর কয়েকটা কাঁচালঙ্কা দাওয়ায় রেখে মাধবের পিসিকে বলে, নাও গো।

এই নাও গো ডাকটুকুর জন্য তারা তিনজন—অর্থাৎ মাধব, বিশ্বেশ্বর আর বিনোদবালা ভোররাত্রি থেকে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে থাকে। রোজই মনে হয়, আজ যদি না ডাকে ?

কানাই অবশ্য এসব নিজের ঘর থেকে দেয় না। সর্বেশ্বরের ধানের গোলা আর আনাজের ক্ষেত থেকেই দেয়। তবু দেয় তো : না দিলে কী হত ?

রবিবার সর্বেশ্বর আর তাঁর গিন্নি আসবেন। শনিবার সকালে উঠে বিশ্বেশ্বর খুব কাহিল মুখে দাওয়ায় বসে একদৃষ্টে একটা কলার ঝাড়ের দিকে চেয়ে বড় বড় শ্বাস ছাড়ছিলেন। এ সময়ে কানাই একটু গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁর পাশে এসে বসল।

তা কিছু ঠিক করলেন ?

বিশ্বেশ্বর ডানহাতখানা উল্টে দিয়ে বললেন, কী ঠিক করার আছে ? আবার পথে বেরোতে হবে আর কি!

দেশে কতটা জমিজমা ছিল আপনাদের ?

বিশ্বেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, জমিজমা বেশী ছিল না। আমাদের ছিল ব্যবসা। ভাল ব্যবসা।

সেটাও কি সর্বেশ্বরবাবু দেখতেন ?

হ্যাঁ। মেজদাই ছিল সর্বেসর্বা।

কানাই একটু মুচকে হেসে বলে, নামখানা একেবারে সার্থক, কী বলেন ?

বিশ্বেশ্বর চুপ করে রইলেন।

কানাই বলল, আপনারা কেন যে এমন ন্যাতানো মানুষ তা বুঝি না। একটু রোখটোখ থাকবে তবে না পুরুষ !

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, রোখ কিসের ?

কানাই একটু রাগের গলায় বলল, আপনার দাদাটিকে আমি খুব চিনি। একেবারে হাড়ে হাড়ে। এ মানুষ যে আপনাদের পথে বসিয়ে এসেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে আইন ওর পক্ষে। কিন্তু আপনারা যদি একটু চোটপাট করতেন তবে বোধহয় এভাবে তাড়াতে সাহস পেত না।

চোটপাট করব ! ও বাবা ! আমি ঝগড়া করতে জানিই না। একবার নারায়ণগঞ্জে একটু বচসা হয়েছিল। তাতেই এমন গো-হারা হেরে যাই।

দূর মশাই ! ঝগড়ায় আবার হারজিত কিসের ? ঝগড়ার নিয়ম হল, চুপ মেরে যেতে নেই, আলফাল যা মনে আসে বলে যেতে হয়। গলাটায় তেজ থাকলেই হল। তাতেই ভয় খায় লোকে।

কিন্তু আমি যে পারি না।

কাল সকালে ওনারা আসছেন, মনে আছে তো!

হ্যাঁ।

শুধু হ্যাঁ বললে তো হবে না, একটা কিছু তো করতে হবে! আমি বলি কি ওরা বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র আপনি আর দিদি ঠাকরুন খুব জোর চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। বলার আপনাদের ঢের আছে। সব মনে করে করে চেঁচিয়ে বলতে থাকবেন। দেখবেন কাজ হবে।

বিশ্বেশ্বর করুণ স্বরে বললেন, পারব কি?

আগে থেকেই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? চেষ্টা করেই দেখুন না। আর দিদিকেও একটু তৈরি করে রাখুন।

দিদি পারবে না। ওর মৃগী ব্যারাম আছে।

সে তো আরো ভাল। সময়মতো যদি ঝগড়ার মাঝখানে ফিট হয় তবে পাঁচজনে আহা-উহু করবে, পক্ষও নেবে। তাতে একটা সুবিধেই। আপনিও পাঁচজনকে সাক্ষী মেনে বলতে পারবেন, এই যে দিদি ফিট হল এর কারণটা কী? কারণ ওই সর্বেশ্বর, আপন মায়ের পেটের ভাই। বাপের সম্পত্তি সব গ্রাস করে নিজের ভাই-বোনকে পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছে। এইসব আগডম বাগড়ম যা খুশি বলে যাবেন। মোটকথা থামবেন না। চালিয়ে যাবেন। কথার পিঠে হিসেব করে কথা বলারও দরকার নেই। এ তো আর চাপান ওতোরের কবির লড়াই নয়। এ হল ঝগড়া। ও ওর কথা বলবে, আপনি আপনার কথা বলে যাবেন। নাগাড়ে চলবে। আমরা ঝাড়ুনীর গাঁয়ের লোক তো, আর কিছু না হোক ঝগড়া জিনিসটা জানি।

বিশ্বেশ্বর একটু সন্দিহান হয়ে বললেন, তোমার মতলবখানা কী বলো তো কানাই, বড় যে ঝগড়া শেখাচ্ছো:

কানাই বেজার মুখে বলল, কারো ভাল করতে নেই মশাই। এর মধ্যে আবার আমার মতলবখানা কী দেখলেন? আপনারা বিদেয় হলেই তো আমার বাঁচোয়া, বাবু কলকাতায় থাকে, আমি জমি জিরেত বাড়ি গরু দেখাশোনা করি। তাতে তো আমারই পোয়াবারো। দু' হাতে লুটতে পারি। এর মধ্যে আপনারা জুটলে তো আমার অসুবিধেই হওয়ার কথা। তবু তাড়াতে চাইছি না কেন?

বিশ্বেশ্বর যুক্তিটা বুঝলেন, বললেন, তাই তো!

কলিযুগ তো। একটা লোক যে আর একটা লোকের ভাল চাইতে পারে এটা আর আজকাল লোকের বিশ্বেস হতে চায় না।

বিশ্বেশ্বর ভারি অপ্রস্তুত হয়ে হেঁ হেঁ করে বিগলিতভাবে বললেন, না না,

তুমি যে ভাল লোক এ আমরা প্রথম দিনই বুঝেছিলাম। জায়গা দিয়েছো, খেতে দিচ্ছো। নিজের দাদা তো মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, চিনতেই পারলে না।

কানাই খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা কথা বলে দিচ্ছি, উচ্ছেদ জিনিসটা খুব সহজ কাজ নয়। আপনি যদি জোঁকের মতো লেগে থাকেন এখানে তবে আপনার দাদার বাবাও আপনাকে চট্ করে তুলতে পারবে না। তবে গালমন্দ সইতে হবে। অপমান গায়ে মাখলে চলবে না। একটা সুবিধেও আপনার আছে। বাবু নিজে গাঁয়ে থাকে না বলে তেমন জোর নেই ওঁর। যে নিজে জমির ওপর বাস করে না তার দখলের জোরটাও কম।

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ খুব ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করে বলেন, যদি ইয়ে, বুঝলে কানাই, যদি মারে ?

মারবে ? কে মারবে ?

দাদা !

মারবে কি মশাই ? এ কী মগের মুল্লুক ? দেওয়ানী কেস, সেখানে ফৌজদারি হবে কেন ?

দেওয়ানী কেস যে সেই মহাভারতের আমল থেকেই ফৌজদারিতে গড়িয়ে আসছে তা বিশ্বেশ্বর জানতো না এমন নয়, তবে বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

কানাই আর বিশ্বেশ্বরের এই কথাবার্তা মাধব আগাগোড়া দাওয়ায় বসে হাঁ করে শুনেছে। শুনে-টুনে ভয় যে তার না হয়েছে এমন নয়। বিশ্বেশ্বরকে সে জানে। ঝগড়া কাজিয়ার লোক নয়। ভীতুও খুব। তার পিসি বিনোদবালাও নির্জীব মানুষ। এরা দু-জনে মিলে কাল সকালে ঝগড়া করবে ভাবতেই তার ভীষণ হাসি পেতে লাগল। আড়ালে গিয়ে আপন মনে একা একা হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করে খুব এক চোট হাসল সে।

বিশ্বেশ্বর সারাদিনই আপনমনে বসে ভাবলেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠলেন, যদি মারে ! অ্যাঁ ! যদি মারে ?

মাধব চুপি চুপি জ্যাঠার বাগানে ঢুকে ছোলার গাছ থেকে কিছু শুঁটি আর কয়েকটা পেঁয়াজকলি আর কিছু কড়াইশুঁটি চুরি করে বেরিয়ে পড়ল। গাঢ় সবুজ রঙের ছোলা আর মটর পেঁয়াজকলি দিয়ে এত ভাল লাগে যে বলার নয়।

ঘুরে-ফিরে ওই কেশব মিত্রের বাড়ির কাছে তাকে রোজই একবার আসতে হয়। এই প্রকাণ্ড বাড়িটার সম্পন্ন চেহারা আর লক্ষ্মীশ্রী তাকে ভীষণ আকর্ষণ

করে। একদিকে ধানের মরাই, পিছনে বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর, নাটমন্দির, বড় বড় দালান, থাম, সিঁড়ি সবই যেন সৌন্দর্যে মাখা।

বাইরের মাঠটায় আজ ছোটো নেট খাটিয়ে কেশব মিত্রের ছেলে আর মেয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলছিল। মাধব তাদের দেখে ফের মুগ্ধ হয়ে গেল। এরা মানুষ না দেবশিশু? মেয়েটা আজ গোলাপী সালোয়ার-কামিজ পরেছে, ছেলেটার পরনে দুধ-সাদা হাফপ্যান্ট আর কলারওলা গেঞ্জি। ছোটাছুটি করে খেলছিল বলে দু-জনেরই মুখ লাল, কপালে ঘাম।

খুব কাছে যেতে সাহস পেল না মাধব। নাটমন্দিরেব এক ধাবটায় বসে 'দূর থেকে দেখতে লাগল। আরো দু-চারটে ভদ্র চেহারার ছেলেমেয়ে কোর্টের পাশে ঘাসে বসে আছে। দান এলে খেলবে। কেশববাবুর ছেলেটাকে দিনের আলোতেও খুব ভাল করে দেখে নেয় সে। হ্যাঁ, চেহারা বটে। রূপকথার রাজপুত্র বুঝি এ রকমই হয়। একটু যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারত! একটু যদি ছুঁতে পারত ওকে! বড় লোভ হল মাধবের। বল কুড়িয়ে দিতে কি ডাকবে? যদি নিজে গিয়েই কুড়িয়ে দেয় মাধব তাহলে রাগ করবে না তো!

কিন্তু ভেবে কিছু ঠিক করার আগেই খেলা শেষ কবে র‍্যাকেট দুই সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভাই-বোনে ভিতরে চলে গেল। এখন হয়তো ওরা দুধ খাবে। ঘন দুধ, তাতে সর ভাসছে, তলায় জমে আছে থকথকে চিনি। ভাবতেই মাধব জিবের ঝোল সড়াৎ করে টেনে নিল মুখের মধ্যে। বহুকাল আগে সে দুধ খেয়েছিল, মনে আছে। সব বড় ভাল জিনিস।

আজও সেই ঝি-টা নাটমন্দির ধোয়াতে এসেছে। চেহারাটা কিছু কাহিল দেখাচ্ছিল। গলায় ফেট্টি জড়ানো। কাশছে। মাধবকে দেখে বিনা ভূমিকায় সটান এসে বলল, সেদিনের মতো একটু জল আজও টেনে দিবি বাবা? বুকে বড় ব্যথা।

মাধব লাফিয়ে উঠল, দেবো পিসি।

দে বাবা। একটা পেয়ারা দেবোখন।

মাধব হেসে মাথা নেড়ে বলল, কিছু চাই না। আমার তো কোনো কাজ নেই, জল টানতে কি?

তুই ইস্কুলে যাস না বুঝি?

না। দেশে থাকতে যেতাম।

মাধব জল তুলে দেয়। ঝি-টা নাটমন্দির ধোয়ায়।

আজ এখানে কী হবে পিসি?

মিটিং হবে। আজ আর প্রসাদ নেই।

কিসের মিটিং ?

ওসব জানি না বাবা। কিছু মাথা-মাথা লোক এক হয়ে গুজুর গুজুর করে। একে কাঠি দেয়, তাকে কাঠি দেয়, ওসব তোর আমার জেনে কাজ কি ? সেদিন কী পেসাদ পেয়েছিলি ?

প্রসাদ পাইনে তো !

পাসনি ? সে কি রে ? শশা ছিল, পাটালি গুড়ের বাতাসা ছিল, কমলালেবু ছিল।

আমি নিইনি।

কেন ? দেয়নি তোকে ?

আমিই নিইনি। লজ্জা করছিল।

তুই তো আচ্ছা ছেলে রে বাঙাল ! প্রসাদ কি না নিতে আছে ?

একটা কথা বলবে পিসি ? কেশববাবুর ছেলের নাম কী ?

ভাল নাম জানি না বাবা। কৌশিক না কী যেন। তবে ডাকে চিতু বলে। মেয়ের নাম বুঝি লোপামুদ্রা না কী যেন। তার ডাকনাম চিমটি। তোর অত খাতনে কাজ কি ? ওসব বড়লোকের বেটাবেটির কাছ থেকে তফাৎ থাকবি। ওরা বড় ভাল নয়। চিমটি কি সোজা মেয়ে ? ভীষণ লাগানি ভাঙানি স্বভাব। দিন রাত এর কথা তাকে লাগাচ্ছে, তার কথা একে। চিতু সে তুলনায় ভালো। ভোলা ভাল ছেলে। কেবল বসে ছবি আঁকে আর বই পড়ে।

ছবি আঁকা কাকে বলে তা জানেই না মাধব। গাঁয়ের স্কুলে অবশ্য একটা ছবি আঁকার ক্লাস হত। কখনো যায়নি মাধব। সেটা থাকত শেষ দিকে। মাধব টিফিনেই পালাত।

কিন্তু ছবি আঁকা নিশ্চযই একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! বই পড়াও !

মাধব দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে একটা কাঠকয়লার টুকরো জোগাড় করে মাটির দেওয়ালে কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করল। একটা গাছ, সূর্য আর পাখি অনেকটা এঁকেও ফেলতে পারল সে। তবু সে জানে, চিতুর মতো হওয়া খুব শক্ত। খুবই কঠিন। পথে অনেক বাধা। আসলে চিতুর মতো হওয়া যায় না। চিতুর মতো হতে গেলে চিতু হয়েই জন্মাতে হয়।

রাত্রে মাধবের খুব ভাল ঘুম হল না। সকালবেলায় সর্বেশ্বর জ্যাঠা আর তাঁর বউ আসবেন। দারুণ ঝগড়া হবে।

না, ঝগড়ার জন্য মাধবের কোনো ভয় ছিল না। বরং উল্টোটাই। ঝগড়া

হবে বলে তার মজা লাগছিল।

মাধব ঝগড়া দেখবে বলে ভোরবেলায় উঠোনের এক ধারে খড়ের গাদায় উঠে বসে ছিল। ভারি নিরাপদ জায়গা। বিপদ বুঝলে গর্ত করে সেঁধিয়ে যাওয়া যায়।

জ্যাঠাইমা আর জ্যাঠামশাই এলেন একটু বেলায়। সঙ্গে পাড়ার কিছু লোক। দূর থেকেই তাদের উচ্চৈস্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

রিকসা থেকে নেমে জ্যাঠাইমা যখন উঠোনে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে দেখে মাধবের তেমন ভয় হল না। চেহারাটা মোটাসোটা বটে, তবে থলথলে। রিকসা থেকে নেমে উঠোন পর্যন্ত আসতেই হাঁফিয়ে পড়েছেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে দম নিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, কোথায় সে ? ডাকো তো !

সর্বেশ্বর জ্যাঠামশাই গলা খাঁকারি দিয়ে একটু উঁচু স্বরে ডাকলেন, কানাই ! ও কানাই ! ওই যে কে এসে দখল নিয়ে বসতে চাইছে তাকে ডাক তো !

মাধব বুঝল, জ্যাঠামশাই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কটাও স্বীকার করতে চাইছেন না। গাঁয়ের আট দশ জন লোক বশংবদ ভঙ্গীতে তাঁদের পিছনে দাড়ালো। এদের সামনে আত্মীয়তা স্বীকার করলে অসুবিধে হবে। নিজের ভাই আর দিদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা তো লোকে ভাল চোখে দেখবে না। মাধব সেই বয়সেও এটা বুঝতে পেরেছিল নিতান্তই সংস্কারবশে।

কানাইকে ডাকতে হল না। বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে এলেন। ইদানীং দাড়ি কামানো হচ্ছে না বলে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে মুখে। চুলগুলো ফণা তুলে আছে মাথায়। গায়ে একটা ভুষো রঙের তুলোর কম্বল। খুবই ব্যাজার দেখাচ্ছিল তাঁকে। তবে ভদ্রতাবোধ হারান নি। দাওয়া থেকে নেমে এসে বউদির পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, বউদি, কেমন আছেন ?

জ্যাঠাইমা আচমকা কথা নেই বার্তা নেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এ আপনাদের কি রকম ব্যবহার ? অ্যাঁ ! কি রকম ব্যবহার ? দেশেরটা তো দু-হাতে খেয়েছেন, জিনিসপত্র বেচে আখের গুছিয়েছেন ! আমরা কপর্দকহীন হয়ে কোনোরকমে এখানে এসে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করেছি সেটাও আপনাদের সহ্য হচ্ছে না ? কী চান আপনারা ? ছেলেপুলের হাত ধরে আমরা পথে গিয়ে দাড়াই !

মাধব পর্যন্ত এই কথা শুনে হতবাক্ হয়ে গেল ! কথাগুলো ডাহা মিথ্যে

বলে নয়। মিথ্যে কথা ছাড়া ঝগড়া হয়ও না। কিন্তু জ্যাঠাইমা এমন কান্না আর দুঃখ মিশিয়ে এত সুরে তালে কথাগুলো বললেন যে, মাধবেরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। অন্য লোকের বিশ্বাস তো হবেই।

বিশ্বেশ্বর বাক্যহারা হয়ে পড়েছিলেন। কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাবা যে হারবে তা মাধবেরও জানা ছিল, কিন্তু ঝগড়ার শুরুতেই এমন চুপ মেরে যাবে এটা সে আশা করেনি।

বিশ্বেশ্বর দাড়ি চুলকোতে লাগলেন। ঢোক গিলতে লাগলেন।

কানাই খড়ের গাদার পাশ থেকে হঠাৎ খকর খকর করে গলা খাঁকারি দিল। সেই শুনে বিশ্বেশ্বরও গলাটা ঝেড়ে নিয়ে হঠাৎ বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, এ বাড়ি আমার! এ বাড়ি থেকে কোন শালা আমাকে তোলে আমি দেখে নেবো! ওই সর্বেশ্বর মল্লিক আমার বাবাকে লোক লাগিয়ে খুন করিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা গাপ করেছিল। ওই সর্বেশ্বর মল্লিক বেনামে আমাদের সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে এসেছে। আমাদের পথের ভিখিরি করে দিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে। সর্বেশ্বর খুনী, পিতৃঘাতী, চোর···

মাধব মুগ্ধ হয়ে গেল। গা গরম হয়ে ওঠায় তার বাবা গা থেকে তুলোর কম্বলটা খুলে ফেলেছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে পাঁজরের জিরজিরে হাড় দেখা যাচ্ছে। রোগা শরীরে মাঝে মাঝে তিড়িং করে লাফও দিচ্ছেন বিশ্বেশ্বর।

কিন্তু ঠিক জমে ওঠার মুখেই ঝগড়াটা আচমকা থেমে গেল। জ্যাঠাইমা "ও বাবা গো, বুকটা···বুকটা···" করতে করতে বুকে হাত চেপে কুঁজো হয়ে বসে পড়লেন। তারপর তাঁর শরীরটা গড়িয়ে পড়ল উঠোনে।

বিশ্বেশ্বরের লাফালাফি আর চেঁচানিতে সর্বেশ্বর এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন যে, নিজের স্ত্রীর পতন ও মূর্ছা প্রথমটায় তাঁর নজরেই পড়েনি।

নজরে পড়েনি বিশ্বেশ্বরেরও। তিনি নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন। তখন তাঁর কথাগুলোও কিছু সৃষ্টিছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন আমাদের বাড়িতে তিনশো মণ সোনা ছিল, সব বেচে দিয়ে এসেছে ওই শয়তান···মাটি খুঁড়ে আমরা একটা পিলসুজ ছাড়া কিছুই পাইনি···সাতমহলা বাড়ি আর পাঁচশো বিঘা ধানী জমি গাপ করেছে······আমি গান্ধীজীর কাছে যাবো, পণ্ডিত নেহেরুকে চিঠি লিখবো···ব্রিটিশদের কাছে যাবো···সুপ্রিম কোর্টে মামলা করব···ইত্যাদি। নাচতে নাচতে তিনি লাকড়ির ঘরে গিয়ে কানাইয়ের কুড়ুলটা নিয়ে এলেন এবং মাথার ওপর তুলে অকারণে ঘোরাতে লাগলেন।

এদিকে সর্বেশ্বরের স্ত্রী শোভনাসুন্দরীকে ধরাধরি করে তুলে দাওয়ায় শোয়ানো হয়েছে। খবব পেয়ে একজন ডাক্তার এসে সেই চেঁচামেচির মধ্যেই তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন, সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। এক্ষুনি হাসপাতালে নেওযা দরকাব।

শোভনাসুন্দরীকে নিয়ে লোকজন চুপচাপ বিদায় হয়ে গেল। কিন্তু বিশ্বেশ্বর নাগাড়ে চেঁচাতেই লাগলেন। চোখ লাল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে, ছেঁড়া গেঞ্জি আরো খানিকটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে, গা থকথক করছে ঘামে। বিনোদবালা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভয়ে জড়োসড়ো। মাধব খড়ের গাদা থেকে নামতে সাহস পাচ্ছে না। কানাই পর্যন্ত কাছে এগোতে ভরসা করছিল না। তবে সেই শেষ অবধি গিয়ে আচমকা জাপটে ধরে বিশ্বেশ্বরকে পেরে ফেলল। কুড়ুলটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, আর নয়। এবার ক্ষ্যামা দিন। ওঁরা সব বিদেয় হয়েছেন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! নিরীহ বিবাদবিমুখ, মুখচোরা বিশ্বেশ্বরের ভিতর একটা বাঁধ হঠাৎ ভেঙে ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিহিংসা এমনভাবে বেরিয়ে আসছে যে তা ঠেকানোর কোনো উপায়ই কেউ করতে পারল না।

কানাই শুধু মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বলছিল, যে কাণ্ড করলেন তাতে পুলিশ না এসে যায় না। এখন চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ জিরোন। পুলিশ এলে বিস্তর বকাবে।

কোন এক বহস্যময় কারণে পুলিশ কিন্তু এল না। জ্যাঠামশাই বা জ্যাঠাইমা বা তাঁদের পক্ষের লোকেরাও কেউ আর এমুখো হল না। তবে পাড়া প্রতিবেশীরা জড়ো হয়েছিল মেলাই। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহসী যুবক বিশ্বেশ্বরকে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে ঘরে নিয়ে শোয়াল এবং বিনোদবালা তাঁর মাথায় জল ঢালতে লাগল।

সেদিন বিকেলে গাঁয়ের রাস্তায় বেরিয়েই মাধব টের পেল, সে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছে। পাঁচ জনে তাকাচ্ছে তার দিকে, কিছু বলাবলিও করছে। মাধব জীবনে এই প্রথম টের পেল তাদের মতো লোকের দিকেও মানুষেরা তাকায় বা তাদের নিয়ে আলোচনা করে। একরকম ভালই লাগছিল তার। জীবনে একেবারে তুচ্ছ হয়ে বেঁচে থাকাটা কিছু নয়। তার চেয়ে তুলকালাম কিছু করে সকলের নজরে থাকাও ভাল।

বাজারের কাছটায় একটা বাঁধানো বটগাছের তলায় কয়েকজন বুড়ো মানুষ গুলতানি করছিল। রোজই করে। তাদের মধ্যে একজন আজ হঠাৎ তাকে দেখে ডাকল, এই খোকা, শোন।

মাধব এগিয়ে গেল, কী বলছেন ?

তুই কি মল্লিকদের ছেলে ?

হ্যাঁ।

সর্বেশ্বর তোর কে হয় ?

জ্যাঠামশাই।

বাঃ, জ্যাঠা একখানা বাগিয়েছিস বটে। তা তোব জ্যাঠাব কাণ্ডখানা কী বল তো ! শুনলুম, নিজের বাপকে কেটে নাকি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে !

মাধবের মাথাটা চড়াক করে উঠল। কথাটা তার সকালে তেমন খেয়াল হয়নি। কিন্তু এ বকম একটা কথা তার বাবা বিশ্বেশ্বর তার জ্যাঠাকে বলেছিল বটে। কী করে যে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কথাটা এসেছিল তা কে জানে ! তবে বলেছিল ঠিকই ঝোঁকের মাথায়। হয়তো এ রকম একটা অস্পষ্ট সন্দেহ বিশ্বেশ্ববের মনের মধ্যে বহুকাল ধরে ছিল। এতদিন প্রকাশ পায়নি : ঝোঁকের মাথায় এখন বেরিয়ে গেছে।

মাধব সত্যি কথাই বলল, আমি জানি না।

কিন্তু তোর বাবাই বলল যে ! অতগুলো লোকের সামনে সকালবেলায় দাঁড়িয়ে কি তোর বাবা মিথ্যে করে বলল ? কই তোর জ্যাঠামশাই বা জ্যাঠাইমা তো কোনো প্রতিবাদও করল না। ঠিক কথাটা বল না !

দাদু জয়ধ্বজ খুন হয়েছেন একথাটা মনেপ্রাণে মাধব কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলে তার চলবেও না। দাদু পঞ্চাশ হাজাব টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় কারণে তিনি আত্মগোপন করে আছেন। একদিন হঠাৎ দেখা দেবেন এবং তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

মাধব তাই মাথা নেড়ে বলল, দাদু মরেনি। সাধু হয়ে গেছে। শিগগির আসবে।

বুড়োরা হাঁ করে তাকে তাকিয়ে দেখল। একজন বলল, আ মোলো, এ যে আবার উল্টো কথা বলে !

আর একজন বলল, আরে না। হিন্দুর ছেলে, চট কবে কি বাপকে মারতে পারে ? ও হল আলাদা রক্ত।

আরে রাখো তোমার হিন্দু। বাঙাল দেশে ও-রকম কত হচ্ছে আকছার। ওখানকার হিঁদু আবার হিঁদু নাকি !

মাধব এইটুকু শুনেই সেখান থেকে সরে পড়ে। বাঙালদের অনেক দোষ।

আজও বাড়ির সামনে নেট টাঙিয়ে চিতু আর চিমটি ব্যাডমিন্টন খেলছিল। তবে আজ মাত্র দু'জনই, অন্য কেউ ছিল না। গাঁয়ের ক্লাবে আজ স্পোর্টস ছিল, বিকেলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আর সেই সঙ্গে থিয়েটার। বাচ্চারা সব সেইখানে গিয়ে জুটেছে আজ। মাধব যায়নি। তাকে ঢের বেশী টানছিল চিতু আর চিতুদের এই বাড়ি।

ভাইবোন খেলতে খেলতে হাপসে পড়েছে। বিশেষ করে চিমটি। কোমর ধরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে হি হি করে হাসছে দাদার দিকে চেয়ে। আর বলছে, উঃ, আর পারছি না। বাব্বাঃ, যা জলতেষ্টা পেয়েছে।

চিতু রাগ করে বলে, এই জন্যই মেয়েদের সঙ্গে খেলতে নেই, জানিস তো! মেয়েরা কিছু পারে না।

আচমকা চিতুর চোখ পড়ল মাধবের দিকে। বলে উঠল, এই, তুই খেলতে পারিস?

হাঁ করে চেয়ে ছিল মাধব। চোখে মুগ্ধ সম্মোহিত ভাব। চিতু যখন তার সঙ্গে কথা বলল তখন তার বিশ্বাসই হল না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ সময় গেল তার বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে। একথা ঠিক যে সে ব্যাডমিন্টন খেলতে জানে না। কিন্তু চিতুকে কি সেকথা বলা যায়? চিতুর জন্য সে এই মুহূর্তে প্রাণ অবধি দিতে পারে।

মাধব ঘাড় নেড়ে বলে, পারি।

আয়। এই চিমটি, তোর র‍্যাকেটটা ওকে দে তো!

হাত বাড়িয়ে র‍্যাকেটটা নেওয়ার সময় সে চিমটির গা থেকে ভারি অদ্ভুত একটা সুগন্ধ পেল। এত সুন্দর গন্ধ সে জীবনে পায়নি। বজ্রযোগিনী গাঁয়ের স্কুলে একটা ছেলে মহাভৃঙ্গরাজ তেল মাখত। আর পালে পার্বনে মহিম শেখের বাড়িতে আতরের তুলো সবাই কানে গুঁজে রাখত। সেইসব সুগন্ধ তার মনে আছে। আর জানে কিছু ফুলের গন্ধ। কিন্তু চিমটির গায়ের গন্ধ অন্য রকম। এ যেন এক অন্য পৃথিবীর গন্ধ, যেখানে মাধব কখনো যায়নি, যেতে পারবেও না কোনোদিন।

মাধব খেলতে জানে না। কিন্তু তার দম অফুরন্ত। পাখির পালকে তৈরি হালকা শাটল্ কক্‌টা ঠিক কোন জায়গায় ফেলতে হবে তার জানা ছিল না। কত জোরে মারতে হবে তাও সে জানে না। গায়ের জোরে মারতে গিয়ে সে প্রথমেই শাটল্ কক্‌টাকে আকাশে ওড়াল। পরের বার ফেলল দশ হাত বাইরে।

চিতু বিরক্ত হয়ে বলে, এই যে বললি জানিস। কিছুই তো জানিস না।

মাধব ভয় খেয়ে বলে, পারব। একটু শিখিয়ে দাও।

অন্য কোনো ছেলে হলে তাকে তাড়িয়ে দিত। চিতুর মনটা নরম। তাড়াল না। বরং হাসল। বলল, এ কি একদিনে শেখা যায়? মিথ্যে কথা বললি কেন বল তো!

মাধব বলতে পারত, তোমার জন্য। তোমার জন্য মিথ্যে কথা তো সামান্য, আরো অনেক কিছু করতে পারি আমি।

কিন্তু সেকথা কি আর বলা যায়! মাধব শুধু লাজুক হাসি হাসল।

তবে প্রচণ্ড অধ্যাবসায়, প্রচণ্ডতর মনোযোগ এবং আগ্রহের বশে সেই একদিনেই খেলাটা প্রায় বারো আনা শিখে ফেলল সে। শিখতেই হবে, নইলে চিতু তাকে কাল খেলায় নেবে কেন?

কিছুক্ষণ খেলেই অবশ্য চিতু খেলা থামাল। বলল, আজ আর নয়।

মাধব বলল, নেটটা গুটিয়ে দেবো?

দে। তুই কোন বাড়ির ছেলে? আগে দেখিনি তো!

খুব যত্নের সঙ্গে নেটটা খুলে ভাঁজ করতে করতে মাধব বলে, ওই সর্বেশ্বর মল্লিকের বাড়ি। উনি আমার জ্যাঠামশাই।

চিতু সর্বেশ্বরকে চিনল না। বলল, অনেক দূর তোদের বাড়ি?

বেশি দূর নয়। কাল আবার আসবো তো?

আসিস।

খেলায় নেবে?

নেবো।

মাধবের মনে হল, সারা জীবনে এর চেয়ে ভাল একটা দিন আর আসেনি। এত সুখ সে কখনো বোধ করেনি। এমন জেগে থেকেও স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও এই তার প্রথম। তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে অলৌকিক আর কি হতে পারে?

মাধবের সেই সুখের দিনটিতেই বিশ্বেশ্বরের পাগলামির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। সুখের এক অচেনা হাওয়ায় বেলুন হয়ে ভাসতে ভাসতে সে যখন বাড়ি ফিরল তখন বিশ্বেশ্বর সারা গায়ে মাটি মেখে শাবল দিয়ে উঠোনের এক কোণে গর্ত করছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন, এইখানেই লুকিয়ে রেখেছে...তিনশো মণ সোনা...তিনশো মণ বাবার লাশটা কোথায় গেল? অ্যা! বাবার লাশ!

বিনোদবালা হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। কানাই দাওয়ায় বসে বিড়ি টানতে টানতে চিন্তিতভাবে চেয়ে ছিল। পুরো দৃশ্যটাকে দৃশ্যমান করছিল

একটা ধোঁয়াটে হ্যারিকেন।

সুখ ও দুঃখের এ রকম মুখোমুখি সংঘর্ষও মাধবের জীবনে বেশী ঘটেনি। সে হাঁ হয়ে চেয়ে রইল। বিশ্বেশ্বর আধপাগল ছিলেনই, এখন পুরোপুরি পাগল।

পাঁচ : মাধবের আবার বিদ্যারম্ভ ও বিশ্বেশ্বরের নতুন জগৎ

বিশ্বেশ্বর সারা রাত ঘুমোলেন না। দাওয়ায় বসে বকবক করতে লাগলেন। ঘরে এসে মাঝে মাঝে দেয়ালে লাথি মেরে দুমদাম শব্দ করলেন। হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন আপনমনে। কেউ ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

পরদিন সকালে কানাই গিয়ে ঝাড়ুনীকে ডেকে আনল। ভূতে পেলে, বিছে কামড়ালে, কিছু হারিয়ে গেলে গাঁয়ের গরিব লোকেরা ঝাড়ুনীকে ডাকে। তার মেলা গুণ। ভূত ছাড়ায়, বিষ নামায়, হারানো জিনিসের সন্ধান দেয়।

মাধব অবাক হয়ে দেখল ঝাড়ুনীর তাদের ওপর কোনো রাগটাগ নেই। দিব্যি স্বাভাবিক মুখেই এসে উঠোনে দাঁড়াল। পরে সে শুনেছে, ঝাড়ুনী পয়সা নিয়ে ঝগড়া করে বটে কিন্তু সেটা রাগ বা বিদ্বেষ থেকে নয়।

ঝাড়ুনী একটা নাপিত ডাকতে বলল। তার কথামতো নাপিত এসে বিশ্বেশ্বরের তালুতে চৌকো করে একটা অংশ কামিয়ে ফেলল। সেখানে ওষুধের চাপান দিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝাড়ুনী চলে যাচ্ছিল। বিশ্বেশ্বর জ্বল জ্বল করে চেয়েছিলেন, এতক্ষণ কিছু বলেননি। এখন হঠাৎ উঠে গিয়ে ঝাড়ুনীর পিছনে ক্যাঁৎ করে একটা জোর লাথি মেরে বললেন, হারামজাদী!

ঝাড়ুনী পড়ে গিয়ে উঠে বিশ্বেশ্বরের গালে একটা থাবড়া মেরে বলল, ঝ্যাঁটা মারি তোর মুখে, গু-খেকোর ব্যাটা!

মাধব হি হি করে হেসে ফেলল।

ঝাড়ুনী চলে যাওয়ার পর বিশ্বেশ্বর খুব গম্ভীর মুখে তুলোর কম্বলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবখানা এমন যেন খুব জরুরী কাজে বেরোচ্ছেন।

বিনোদবালা দৌড়ে এসে মাধবকে একটা ঠেলা দিয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে, যা যা, তোর বাপের পিছু পিছু যা। কোথায় যাবে, কী করবে ঠিক নেই। কাউকে বুঝি মেরেই বসে।

মাধব বিশ্বেশ্বরের পিছু নিল। তবে বিশ্বেশ্বর তেমন বিপজ্জনক কিছু করলেন না। খুব গম্ভীর মুখে পিছনে হাত দিয়ে এবং একটু ঝুঁকে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে রাস্তার পাশের কোনো বাড়িকে লক্ষ্য করেন। কোনো গাছের নিচে এসে ওপর দিকে চেয়ে কী যেন খুব মন দিয়ে দেখতে থাকেন। বাজারে ঢুকে প্রায় সব ব্যাপারীর কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র নিরীখ করেন। এইভাবেই চলতে থাকল। বাবার পিছু নিতে গিয়ে হাঁফ ধরে গেল মাধবের। সে বলল, বাবা! ও বাবা! বাড়ি চলুন।

দাঁড়াও, কাজ আছে।

পাগলদের কাজের অন্ত থাকে না, একথা মাধব অভিজ্ঞতাবলে জানে। কাজেই সে এক সময়ে বিশ্বেশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়ল।

বিশ্বেশ্বর একবার মাধবের দিকে চাইলেন পিছন ফিরে। ডান হাতি ঢালু জমি বেয়ে নেমে একটা পুকুরের পাড় ধরে ছেলেটা চলে যাচ্ছে। তিনি জানেন, এটা তাঁরই ছেলে। কিন্তু চিন্তার বিচ্ছিন্নতাবশত তিনি নিজেকে সুস্পষ্ট "আমি" বলে অনুভব করতে পারছিলেন না। ফলে, "আমার ছেলে" এই বোধটাও তাঁর আর অবশিষ্ট ছিল না। তবে এই ছেলেটিকে দেখলেই তাঁর কথা দুটি মনে পড়ে যাবে "আমার ছেলে।"

চারদিকে চেয়ে বিশ্বেশ্বর বুঝলেন তিনি একটা ভারি নতুন জায়গায় এসে পড়েছেন। এখানে কোনো কিছুর সঙ্গেই আর কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই। চারদিকে যা কিছু দেখছেন সবই বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্করহিত। যেমন তিনি আকাশ চেনেন, পুকুর চেনেন, গাছ চেনেন, রাস্তা কাকে বলে জানেন, কিন্তু এগুলো এখানে কেন রয়েছে, এসবগুলো মিলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় তা আর তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।

একটা বাঁধানো গাছতলার নিচে কয়েকজন বুড়ো মানুষ বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাতছানি দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে ডাকল। বিশ্বেশ্বর ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন। হাতছানি দেওয়াটার অর্থ তাঁর বোধগম্য হল না। তবে আশ্চর্যের বিষয় তিনি নিতান্ত অভ্যাসবশে এগিয়ে গেলেন।

বুড়োরা সরে একটু জায়গা করে দিল বসার জন্য। একজন ভারি খাতিরের গলায় বলল, আরে বসুন, বসুন। আপনিই তো সর্বেশ্বরের ছোটোভাই, তাই না?

বিশ্বেশ্বর খুব সন্দেহের চোখে চেয়ে রইলেন। একটা গাছ, তার তলায় কয়েকটা লোক কেন বসে আছে সেটা তিনি বুঝলেন না। এভাবে বসে

থাকার মানে কি ? তিনি তবু বসলেন এবং একজন ধূমপায়ী বুড়োর দিকে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে বললেন, একটা সিগারেট দিন তো, খাই।

লোকটা একটু থতমত খেল এবং অনিচ্ছের সঙ্গেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কথাটা কি তাহলে সত্যি ? আপনার বাবাকে ওই সর্বেশ্বর মল্লিকই লোক লাগিয়ে খুন করায় !

সিগারেটটা তাঁর বেশ লাগছিল খেতে। তিনি নীরবে বসে টেনে যাচ্ছিলেন। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। একজন বুড়ো কানের কাছে মুখ এনে বলে, বলি ও কর্তা।

বিশ্বেশ্বর ভিতরে ভিতরে খুব একটা দেমাক বোধ করছিলেন। এই শালারা কিছু জানে না। ভাবতেই তাঁর খুব হাসি পেল এবং তিনি হাসতে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে কিছুক্ষণ কাশলেন। তারপর ফের হি হি করে হাসতে লাগলেন দুলে দুলে। তিন বুড়ো হাসি দেখে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। একজন বলল, পাগল নাকি !

তোর বাবা পাগল। বলে বিশ্বেশ্বর উঠে খুব গম্ভীরভাবে হাঁটতে লাগলেন। চারদিকে চেয়ে এই নতুন জগৎটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সামনেই একটা পুকুব দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এটা যে পুকুর এটা তিনি জানেন। কিন্তু এখানে পুকুরটা থাকার মানে কি ? কেন এটা এখানে রয়েছে ? ভাবতে ভাবতেই তিনি পুকুরের দিকে মুখ করে পেচ্ছাপ করতে বসলেন এবং বললেন, জল বাড়িয়ে দিয়ে গেলাম। এখন খা শালারা জল তুলে।

পেচ্ছাপ করে বেশ আনন্দ হল তাঁর। মনে হল একটা কাজের মতো কাজ করা গেছে। এরকম কাজ আরো কিছু করা যায় না ? ভাবতে ভাবতে তিনি সামনেই একটা চলন্ত রিকসা দেখে হাত তুলে বললেন, রোখকে রোখকে।

রিকসাটা থামল। বিশ্বেশ্বর উঠে পড়লেন। বস্তুত তিনি বহুকাল রিকসায় চড়েন নি। তাঁর খুবই ভাল লাগতে লাগল।

রিকসাওলা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন ?

চলো একটু ওদিকটা ঘুরে আসি।

রিকসাওলা সন্দিহান চোখে সওয়ারির দিকে তাকাল। বিশ্বেশ্বরের চেহারা রিকসায় ওঠার মতো নয়। পকেটে পয়সা আছে বলে মনেও হয় না। কাজেই সে জিজ্ঞেস করল, ভাড়া দেবেন তো।

ভাড়া ! খুব হাসি পেল বিশ্বেশ্বরের। ভাড়া কিসের ? ভাড়াটা আবার কিসের ? শালারা বোঝে না। তিনি তো কোথাও যাবেন না। একটু ঘুরে

আসবেন মাত্র। তাতে ভাড়ার কথা ওঠে কেন?

রিকসাওলা তেড়িয়া হয়ে বলল, নেমে যান তো দাদু। নামুন।

বিশ্বেশ্বর নামবার পাত্র নন। গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন।

বেশ একটা চেঁচামেচি আর গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। কিন্তু তবু রিকসায় বসে থাকতে বিশ্বেশ্বরের খুবই ভাল লাগছিল। কিছু লোক রিকসা ঘিরে ধরে চেঁচামেচি করতো ঠিকই, কিন্তু তাদের অগ্রাহ্য করে তিনি চারদিকে চেয়ে তাঁর নতুন জগৎটিকে দেখছিলেন। তাঁর মনে হল জীবনে আর দুঃখ করার মতো কিছুই নেই। এখন তিনি যা খুশি করতে পারেন।

এইভাবেই বিশ্বেশ্বর আর সকলের সঙ্গে এক মাটিতে থেকেও একটা আলাদা জগতে বসবাস শুরু করলেন। রোজই তিনি আগের দিনের কথা ভুলে যেতেন। রোজই যা করতেন, মনে হত, এ ভারি নতুন কিছু একটা করা গেল।

যেদিন বিশ্বেশ্বর তাঁর নতুন জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন সেইদিন মাধবও এক নতুন জগতের সন্ধান পেল।

সেইদিন বিকেলে সে যথারীতি হাজির হয়েছিল চিতুদের বাড়ির মাঠে। অনেক ছেলেপুলে ভিড় করেছিল কোর্টের চারদিকে। সেই ভিড় দেখে মাধবের বুক দমে গেল। আজ আর চিতু খেলতে ডাকবে না তাকে।

কিন্তু মাধবের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ছেলেদের মধ্যে র‍্যাকেট নিয়ে একটা ঝগড়া বেঁধে উঠল। মারপিট লাগার উপক্রম। একটা গোঁফওয়ালা ষণ্ডামতো লোক চেঁচামেচি শুনে ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে উঠল, অ্যাই চোপ! বেরো বেরো এখান থেকে। কান ধরে বেড়াল-পার করে দেবো একেবারে।

সেই রক্তচক্ষু আর বজ্রগর্জন এবং সেই পেল্লায় চেহারা ও গোঁফ এমনই ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যে, চোখের পলকে ছেলেগুলো হাওয়া হয়ে গেল। চিতু একা বেকুবের মতো নিজের কোর্টে দাঁড়িয়ে আছে। আজ চিমটিও নেই। চিতু একদম একা।

লোকটা গন্‌গন্‌ করতে করতে ফের ভিতর-বাড়িতে চলে যাওয়ারও অনেকক্ষণ পরে মাধব কোর্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি খেলব?

চিতু তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসি যে কী সুন্দর তা বলার নয়। বলল, আয়।

পাখির পালকে তৈরি একটা কলকের মতো দেখতে পলকা জিনিস আর জাল লাগানো বড় হাতার মতো ব্যাট যে কী অফুরন্ত আনন্দ দিতে পারে তা

খেলতে গিয়ে বুঝল মাধব। আসলে খেলাটা তো নয়, তার আনন্দের উৎস ছিল ঐ চিতু।

খেলার পর আজও মাধব নেট গুটিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, কাল আবার আসবো তো ?

চিতু মাথা নেড়ে বলে, কাল তো আমরা কলকাতায় চলে যাচ্ছি।

মাধবের ভিতরে যেন একটা আলো নিভে গেল। করুণ স্বরে সে বলল, আবার কবে আসবে ?

তার কিছু ঠিক নেই। তুই যেন কোন বাড়ির ছেলে !

সর্বেশ্বর মল্লিক। ওই ওদিকে। হাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করল মাধব।

চিতু চিনল না। তবে মাথা নেড়ে বলল, র‍্যাকেট আর নেট আমার ঘরে পৌঁছে দিবি আয়।

মাধবের যেন বিশ্বাস হল না। চিতু তাকে তার ঘরে ডাকছে ! সত্যিই ডাকছে ? সে ভুল শুনছে না তো !

চিতুর পিছু পিছু নেট আর র‍্যাকেট নিয়ে যখন এই স্বপ্নের বাড়িটার দোতলায় উঠছিল মাধব তখন তার চোখের পলক পড়ছিল না। বজ্রযোগিনী গাঁয়ে তাদের বাড়ি আরো বিশাল ছিল বটে, কিন্তু তার এমন শ্রী ছিল না। জ্ঞান হয়ে অবধি সে দেখেছে নোনাধরা দেয়াল, ঝুলে আচ্ছন্ন ঘর, ফাটা চটা ওঠা মেঝে, ভাঙা রেলিং, আসবাবপত্র নিতান্তই সামান্য। চিতুদের বাড়ি ঝকঝকে, তকতকে। কত জিনিস। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই সে দেয়াল-ঘড়ির টং শব্দ শুনতে পেল।

যে ঘরে চিতু তাকে নিয়ে এল সেই ঘরে একধারে মস্ত একটা পালঙ্ক। কালো পালিশওলা সেই পালঙ্কে পদ্মফুলের নকসা। বিছানায় বুক অবধি লেপ টেনে শুয়ে আছে চিমটি। হাতে খোলা বই। সাড়া পেয়ে তাকাল।

এই দাদা, ও কে রে ? কালকের সেই ছেলেটা না ?

হ্যাঁ।

ওর নাম কি ? এই, তোর নাম কী রে ?

মাধবচন্দ্র মল্লিক।

মাধবচন্দ্র ! হিঃ। হিঃ।

চিতু ধমক দিল, হাসার কী হল ?

ঐটুকু ছেলে তার নামে আবার চন্দ্র। এই তুই কী পড়িস ?

মাধব লাজুক মুখে মাথা নেড়ে বলে, পড়ি না।

এ জবাবে অবাক হল না চিমটি। এ রকম বহু ছেলে পড়ে না। তবু সে জিজ্ঞেস করে, এ বি সি ডি জানিস ?

জানি।

অ আ ?

জানি ?

অক্ষর লিখতে পারিস ?

তা পারি।

ওমা ! তবে তো অনেক জানিস !

মাধব চিমটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমার কী হয়েছে ? শুয়ে আছো যে !

চিমটি একটু অবাক হল এ প্রশ্নে। যেন তার কুশল জিজ্ঞাসা করাটাও মাধবের একটা স্পর্ধা। তবে চিমটি একটু করুণ করে হাসার চেষ্টা করে বলল, জ্বর। নিরানব্বই। নিরানব্বই কী বল তো !

জ্বরের মাপ তো। থার্মোমিটারে ওঠে।

তুই তো অনেক কিছু জানিস। কমলালেবু খাবি ? বলে চিমটি পাশের একটা গোল টেবিল থেকে একটা কমলালেবু তুলে হাতটা বাড়িয়ে বলল, নে।

মাধব লজ্জা পেয়ে মাথা নেড়ে বলে, আমার লাগবে না। তুমি খাও।

আমি সারাদিন খাচ্ছি। তিনটি বিচি গিলে ফেলেছি খেতে গিয়ে। হিঃ হিঃ।

হাসিটা এত সুন্দর যে মুখ থেকে খুঁটে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মাধব কমলালেবু খুব লজ্জার সঙ্গে নিল। তবে খেল না। মুঠোয় করে রইল।

চিমটি বলল, তুই আর কী পারিস ?

আমি ! বলে মাধব মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। সে পারে অনেক কিছু। আবার পারে নাও অনেক কিছু। কোনটা বললে মেয়েটাকে খুশি করা যাবে তা সে ভেবে পেল না। তাই বেশী চিন্তা না করেই বলল, আমি সাঁতার কাটতে পারি, ছুটতে পারি, গাছ বাইতে পারি, পাখি ধরতে পারি, বাসন মাজতে পারি।

দূর বোকা ! অ্যারিথমেটিক পারিস ? বল তো তিন সাতে কত হয়।

একুশ। ও তো নামতা।

তাহলে যে বললি পড়িস না !

পড়তাম। দেশে থাকতে। এখন আর পড়ি না।

কেন পড়িস না ?

কেউ পড়তে বলে না তো !

তোর কেউ নেই ?

আছে। পিসি আর বাবা।

কোন বাড়িতে থাকিস ?

সর্বেশ্বর মল্লিকের বাড়ি।

সেটা আবার কে ?

আমার জ্যাঠামশাই।

কোন বাড়িটা বল তো !

দরগার কাছে। মাটির বাড়ি।

ও মা ! ও তো রহিম শেখের বাড়ি !

ওটাই। রহিম চাচা মরে গেছে।

চিমটি লেপ ফেলে উঠে বসল, মরে গেছে ! কবে ?

এক বছর হবে। সাপে কামড়েছিল।

ইস। চিমটির চোখ ছলছল করতে থাকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুই হানাকে চিনিস ?

হানার নামে মাধবের বুকটা দোল খেয়ে গেল। সেই মুড়ি কদমা. সেই মুখ ভেঙানো। বলল, চিনি। তুমি চেনো ?

ওমা : চিনব না কেন ? হানা আমাদের বাড়ি রোজ ছাগলের দুধ দিয়ে যেত। কত খেলতাম আমরা ! তুই ওদের চিনলি কি করে ?

দেশের বাড়িতে।

রহিম চাচার বাড়ি যারা কিনেছে তারা তো বাঙাল।

আমাদের ঢাকায় দেশ।

তাই তোর কথাগুলো যেন কেমন !

মাধব খুব লজ্জা পায়। একটু হাসে।

লুডো খেলতে পারিস ?

মাধব ঘাড় নাড়ে। পারে।

তাহলে কাছে এসে বোস মেঝের ওপর। বলে লুডোর ছকটা বালিশের পাশ থেকে নিয়ে সামনে বিছানার ওপরেই পাতল চিমটি। তারপর হঠাৎ বলল, এঃ তোর গায়ে যা গন্ধ না ! ভূত পালায়। স্নান করিস না ?

করি। মাধব খুব অপ্রস্তুত হয়ে বলে।

তাহলে গায়ে ও রকম চিমসে গন্ধ কেন ?

চিতু এতক্ষণ একটা চেয়ারে বসে জিরোচ্ছিল । কিছু অন্যমনস্ক গম্ভীর কথা তার কানে যাচ্ছিল না । এখন হঠাৎ বোনকে ধমক দিয়ে বলল, গন্ধ সহ্য হয় না তো খেলতে ডাকছিস কেন ? ওরা তো তোর মতো সাবান দিয়ে চান করে না ।

চিমটি গুটি সাজাতে সাজাতে বলে, ঠাকুমা তোকে এ ঘরে দেখলে খুব বকবে । ঠাকুমার যা শুচিবাই ।

তাহলে আমি চলে যাই ?

না, বোস । ঠাকুমা দোতলায় উঠতে পারে না । কোমরে বাত তো ।

তোমার মা বকবে না তো !

চিমটি মাথা নাড়ে, না । মা কাউকে বকে না । তোর ভয় নেই ।

মাধব যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ স্বপ্নের মতো, ঘোরের মতো একটা কিছু ঘিরে ছিল তাকে । এত কাছাকাছি চিমটি আর চিতুকে দেখবে, তাদের সঙ্গে খেলবে, তাদের ঘরে ঢুকবে এ তার সব ধারণার বাইরে ছিল । সারাক্ষণ এক স্বর্গের গন্ধ পেল সে, স্বর্গের শব্দ শুনল ।

খুব বেশীক্ষণ নয় অবশ্য । দু দান খেলতেই চিমটির চোখ ছলছল করতে লাগল । নিজেই নিজের গায়ের তাপ দেখল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে । শ্বাস গরম কিনা পরীক্ষা করল নিজের হাতে শ্বাস ফেলে । শঙ্কিত-হৃদয় মাধব চেয়ে ছিল তার দিকে । জিজ্ঞেস করল, জ্বর আসছে তোমার ?

বোধহয় । মাথাটা ধরেছে । তুই এখন যা । আমরা যখন আবার আসব তখন আসিস ।

তুমি জ্বর গায়েই কাল চলে যাবে ?

চিমটি করুণ গলায় বলে, স্কুল আছে না !

পারবে যেতে ?

দেখি । আমি তো গাড়ির পিছনের সীটে শুয়ে থাকব ।

তোমাদের গাড়ি আছে ?

দুটো । তোকে চড়াবো একদিন । আমি যখন চালাতে শিখব তখন ।

মাধব মাথা নাড়ল । কমলালেবুটা বুকে নিয়ে উঠে পড়ল ।

চিতু চেয়ারে বসে একটা বই দেখছিল । তাঁর দিকে চেয়ে বলল, তুই স্কুলে পড়িস না কেন ?

স্কুলে ! বলে খানিকক্ষণ ভাবল মাধব । তারপর বলল, আমাকে নেবে না ।

কেন নেবে না ?

মাইনে দিতে হবে না ? কে দেবে বলো !

তোরা খুব গরিব, না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা যা। সামনের শনিবার দেখা করিস।

তুমি আসবে ?

আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শুক্রবার আসি। সোমবার খুব ভোরবেলা চলে যাই।

এরা যে একটু অন্যরকম তা বুঝতে পারছিল মাধব। তার মতো হা-ভাতে ছেলেকে এরা পাত্তা দেয় না। কিন্তু এরা দিল। কেন দিল তা বুঝতে পারে না সে। শুধু বুঝতে পারে এরা অন্যরকম।

চিতু আর চিমটি যে অন্যরকম সে বিষয়ে মাধবের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই। তার কারণ হল, চিতু ও চিমটির বাবা কেশব মিত্র এম এল এ এবং একজন নেতা হওয়ার দরুন তাঁর বাড়িতে হরবখত নানা রকম লোকের আনাগোনা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই চিতু আর চিমটি নানা রকমের লোক দেখতে অভ্যস্ত। ফলে মানুষ সম্পর্কে তাদের তেমন কঠোর ভেদবুদ্ধি নেই। উপরন্তু চিতু ও চিমটির দাদামশাই এবং মামারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ধার্মিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। মামাবাড়িতেও তারা সর্বদা অর্থী প্রার্থীদের অন্তহীন আনাগোনা দেখেছে। মানুষ সম্পর্কে তাদের শুচিবায়ু তো নেই-ই, উপরন্তু গরিব নাচার কাউকে দেখলে তারা একটু বেশী সহৃদয় হয়ে ওঠে।

এই ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই মাধব স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। সম্পূর্ণ ফ্রি এবং বইখাতাও স্কুল থেকে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সে চিতুর কিছু পুরোনো জামা-প্যাণ্ট পেয়ে গেল। আর চিমটি তাকে দিল একখানা সাবান।

কারো কারো মনে হতে পারে যে, এ হল ইচ্ছাপূরণের গল্প ! সে রকম মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিকও। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মাধব আছে। তাদের চিতু বা চিমটির মতো শুভানুধ্যায়ী হুট করে কেউ জুটে যায় না। তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। পুরোনো জামা-প্যাণ্ট বা সাবানও পেয়ে যায় না। এসব গল্পেই সম্ভব। এবং এর পর হয়তো মাধব পরীক্ষায় ফার্স্টও হতে থাকবে, চাই কি চিমটির সঙ্গে প্রেমও ঘটে যাবে, যেমনটা গল্পে ঘটে আর কি !

একথা ঠিকই, মাধব নামক আহাম্মকটির জীবনের এই অংশে এ রকম একটু ইচ্ছাপূরণের ঘটনা আকস্মিকভাবেই ঘটে যায় ! কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এবং মাধবের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব শেষ হলে কী দাঁড়ায় সেইটিই

আমাদের মতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ছয় : সর্বেশ্বরের বিপদ ও বিশ্বেশ্বরের নানা অভিজ্ঞতা

শোভনাসুন্দরী আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় সর্বেশ্বর যে ঘোরতর বিপদে পড়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। ভাগ্যক্রমে কেশব মিত্র সেদিন গ্রামে ছিলেন, তাই তাঁর গাড়িতে শোভনাসুন্দরীকে বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। দিন দশেক হাসপাতালে থেকে কিছু সুস্থ হলে সর্বেশ্বর তাঁকে কলকাতা নিয়ে যান।

সুস্থ হওয়ার পর কলকাতা যাওয়ার সময় ট্রেনের কামরাটা তাঁরা ফাঁকা পেলেন। শনিবার বিকেলের ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার ভিড় থাকে না। ট্রেনের কামরাতেই শোভনাসুন্দরী সর্বেশ্বরকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, হ্যাঁ গো, ঠাকুরপো ওসব কী বলছিল ?

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, কী বলছিল ?

কেন তুমি কি শোনোনি !

সে পাগলাটা কী সব আগড়ম বাগড়ম বকছিল তার কি কিছু ঠিক আছে ? এই তো লোক মারফত খবর পেলাম সেটা নাকি পুরো পাগল হয়ে গেছে। ন্যাংটা চ্যাংটা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

তা হোক। ঠাকুরপো তো একটু আধ-পাগলা ছিলই। কিন্তু কথাগুলো যে সর্বনেশে। এক গাঁ লোক তা শুনেছে। তুমি নাকি লোক লাগিয়ে শ্বশুরমশাইকে খুন করিয়েছো। বাবা গো ! ভাবলে যে গা শিউরে ওঠে !

সর্বেশ্বর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল। শোভনাসুন্দরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীকে লক্ষ্য করছিলেন। এই মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘর করার ফলে তিনি এঁর সবরকম ভাব ও ভাবান্তর জানেন। সুতরাং লক্ষণটা তাঁর ভাল ঠেকল না।

সর্বেশ্বর ভারি দুর্বল গলায় বললেন, কী যে বলো ! তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

শোভনাসুন্দরী মাথা নেড়ে বললেন, আমি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিনি, তুমি ভেবো না। কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে ?

বলব না কেন ! তোমার কাছে আমি কি কোনোদিন কিছু লুকিয়েছি ?

আমার মনে আছে শ্বশুরমশাই যখন টাকা নিয়ে কলকাতা রওনা হবেন বলে তৈরি হচ্ছেন তখন তুমি তাঁকে অতগুলো টাকা নিয়ে বেরোতে নিষেধ

করেছিলে। উনি তোমার নিষেধ শোনেননি। উনি যখন সত্যিই রওনা হয়ে গেলেন তখন তোমার মুখচোখ যেন কেমনধারা। একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। বাপের জন্য চিন্তা হচ্ছিল তা বুঝি, কিন্তু তোমার মুখ-চোখে সেরকম উৎকণ্ঠার ভাবটা ছিল.না। তখন লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু তেমন কিছু তলিয়ে ভাবিনি। সেদিন হঠাৎ ঠাকুরপোর কথা শুনে কেন যেন মনে হল, কি জানি বাবা!

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, মনে হল? বলো কি!

শোভনাসুন্দরী স্বামীর চোখের দিকে চেয়েছিলেন। বললেন, শ্বশুরমশাইয়ের ভাল-মন্দ যা কিছু হয়েছে তার জন্য তুমি দায়ী নও জানি। কিন্তু তখন তোমার ওরকম ভাবখানা হয়েছিল কেন?

বাঃ, বাবার জন্য চিন্তা হবে না?

শোভনাসুন্দরী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর স্বামী সত্যি কথা বলছেন না। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, চিন্তাই যদি হবে তাহলে অতটাকা ওঁকে নগদে নিতে দিলে কেন? হুণ্ডি কাটার অসুবিধে কী ছিল? উনি তো তোমাকে হুণ্ডির কথা বলেছিলেন।

সর্বেশ্বর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, বললেই তো হল না। পরদিন সকালে উনি বেরোবেন, আর মোটে আগের দিন সন্ধেবেলা টাকা জোগাড় হল। অতগুলো টাকার হুণ্ডি কি হুট করে হয়! মেয়েমানুষ তুমি; অত কথায় কাজ কি?

শোভনাসুন্দরী তবু স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

একথা ঠিক যে এসব কথাবার্তা থেকে শোভনাসুন্দরীকে ভাল মানুষ বলে মনে হলেও তিনি মোটেই তা নন। স্বামীকে এভাবে জেরা করার পিছনে তাঁর একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ শোভনাসুন্দরী সর্বেশ্বরের উপযুক্ত স্ত্রী: তাঁর স্বামী এযাবৎ যেসব কুকর্ম করে ভাই-বোনকে সর্বস্বান্ত করেছেন তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। এমন কি তিনি সর্বেশ্বরকে এব্যাপারে যথেষ্ট প্ররোচনাও দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর কোনো কাজ তাঁর অগোচরে থাকবে এটা তাঁর কাছে অসহ্য। জয়ধ্বজের কলকাতা রওনা হওয়ার সময় এবং পরের কয়েক দিন যে সর্বেশ্বর খুব অস্থিরতা ও অপরাধবোধের মধ্যে কাটিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঠিক কারণটা কী তা শোভনাসুন্দরী আজও জানেন না। তবে কারণ যে একটা আছেই এবং সেটা যে বেশ গুরুতর তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। শোভনাসুন্দরী আপাতত অবশ্য চুপ করে গেলেন। বাড়ি ফিরে আসার কয়েকদিন পর গায়ে খানিকটা

জোরবল পেয়ে শোভনাসুন্দরী একদিন স্বামীকে বললেন, দেখ, আমার বুকের ওপর যেন ওরা বসে আছে !

আতঙ্কিত হয়ে সর্বেশ্বর প্রশ্ন করলেন, কারা ?

ঠাকুরপো আর ননদ ঠাকরুণ ! আমার ভিটে থেকে যতদিন ওদের না তাড়াতে পাবো ততদিন আমার বুকের ব্যামো কমবে না ! ওদের কথা ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে । যদি আমাকে বাঁচাতে চাও তো ওদের তাড়াও ।

সর্বেশ্বরের তাতে অমত নেই, বরং খুবই মত আছে । কিন্তু কেন জানিনা তিনি একটু ভয় খেয়েছেন । কারণ বিশ্বেশ্বরকে তিনি চিরকালই অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে জানেন । গান, মদ এবং মেয়েমানুষের কিছু নেশা বিশ্বেশ্বরের ছিল বটে কিন্তু সেটা সঙ্গদোষ, নিষ্কর্ম জীবন এবং প্রচুর টাকা হাতে থাকার ফলে ঘটেছিল । আদতে লোকটা মাটির মানুষ । সেই বিশ্বেশ্বর যে এরকম ক্ষেপে যেতে পারে এটা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর । বিশ্বেশ্বরের ওই রুদ্রমূর্তি দেখেই তাঁর স্ত্রীর হৃদরোগের আক্রমণ ঘটে । তাঁরও ঘটতে পারত । কেন যে ঘটেনি সেইটেই আশ্চর্যের বিষয় । কানাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখে জানাচ্ছে যে, বিশ্বেশ্বর দিনে দিনে আরো ভয়ংকর হয়ে উঠছে ! পাগলামির এখন চূড়ান্ত অবস্থা । এ খবর পেয়ে সর্বেশ্বরের ভয়টা আরো বেড়েছে ।

স্ত্রীর কথার জবাবে সর্বেশ্বর বললেন, দেখি ; থানা-পুলিশ করতে হবে দেখছি ।

শোভনাসুন্দরী স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলেন । তাঁর এই স্থির চক্ষুর দৃষ্টি সর্বেশ্বর কোনোদিনই বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। শোভনা বললেন, থানা-পুলিশ করতে চাও তো করো । দেরি করছ কেন ? দেরি করলে আর ওদের ওঠাতে পারবে ভেবেছো ? গাঁয়ে আমাদের শত্রুর অভাব নেই । তাদের সঙ্গে সাঁট করে ওরা চেপে বসবে জমির ওপর ।

সর্বেশ্বর বললেন, হুঁ ।

হুঁ মানে ? তুমি গা করছো না কেন ? ননদ ঠাকরুণটিকে বড় সোজা পাত্রী ভেবো না। মাঝে মাঝে ভিরমি খায় বলে সবাই ভাবে গোবেচারা । তা কিন্তু নয় । শাশুড়ির গলায় একটা আঠারো ভরির বিছেহার ছিল, দু হাতে দুটো অনন্ত, দশ গাছা চুড়ি । সেগুলো উনি ছাড়া আর কে হজম করবে পারে ? মরার সময় উনিই কাছে ছিলেন ।

সর্বেশ্বর একথাটা পাশ কাটালেন। তিনি ভালই জানেন এই কৃতিত্ব তাঁর দিদি বিনোদবালার নয়। তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বজ্রযোগিনীতে হানা দিয়ে সেইসব গয়নার সদ্গতি করে এসেছেন। তবে শোভনাসুন্দরীকে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। মেয়েমানুষকে সব কথা বলতে নেই। শুধু বললেন, হুঁ।

এবারও শোভনা তাঁর স্বামীর মুখ নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল, সর্বেশ্বর তাঁর কাছে কী যেন আর একটা গুপ্তকথা লুকোলেন। এ জিনিস তিনি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ ভিন্ন একটা পন্থা অবলম্বন করলেন। আচমকা চোখের তারা উল্টে নিমীলিত নয়নে উর্ধ্বপানে চেয়ে বললেন, ভগবান জানেন, তোমার মনে কী আছে, কেনই বা তুমি ভয় পাচ্ছো। ঠাকুরপো যা বললে তা যদি সত্যিই না হবে তাহলে তোমার এত ভয়ের কি তাও তো বুঝি না।

সর্বেশ্বর বিষয়ী এবং বুদ্ধিমান হলেও তাঁর কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করেছিল। তিনি আর গোপনীয়তার ভার একা বহন করতে পারছিলেন না। তাই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু খাটো গলায় বললেন, বলছি কাজটা তেমন খারাপও করিনি। একটু সাবধান হয়েছিলাম মাত্র। বাবা যে গেঁজেটায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ভরেছিলেন সেটা আমি রাত্রে সরিয়ে নিয়ে টাকা বের করে তাতে কাগজ ভরে দিই। জানতাম পথে ডাকাতি হবেই তাছাড়া বাবা যে টাকা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন এখবরও কর্মচারীরা রাখত টাকার কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছিল।

শোভনাসুন্দরী উঠে বসলেন। তাঁর বুকের ভার অনেকটা নেমে গেছে খুব ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, খারাপ কাজ কেন হবে! ঠিকই করেছো, কিন্তু আমাকে বললে তো পারতে।

বলিনি একটু লজ্জা করছিল বলে। কিন্তু দেখলে তো, সেই ডাকাতি হলই।

ডাকাতি যে হয়েছিল তা ঠিক জানো?

না। তবে আর কী হতে পারে?

কিন্তু সে তো বহুকাল আগেকার ঘটনা। এখন তোমার অত ভয় ভয় ভাব কেন?

সর্বেশ্বর একটু চিন্তা করে বললেন, বাবাকে আমি খুন করাইনি। শত লোভ থাকলেও ও কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। কিন্তু বিশ্বেশ্বর টাকার কথাটা তুলছে। বলছে টাকাটা আমিই গাপ করেছি। তাই ভাবছিলাম

কোনো খবর-টবর পেয়েছে কিনা। পাওয়ার কথা নয়, তবু কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

শোভনা হেসে বললেন, কুলোপানা চক্কর দেখেই ভয়! এইজন্যই বলে বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। ঠাকুরপো ঃ ভাবে অনটনে ওরকম হয়ে গেছে, তাই সব ব্যাপারেই অন্যকে সন্দেহ করছে। ও নিয়ে ভেবো না। বর্ধমানে গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করো। দরকার হলে মোটা ঘুষ দাও। ওদের তুলতেই হবে।

সর্বেশ্বর বিষয়ী এবং বুদ্ধিমান। স্ত্রীকে সমীহ করলেও স্ত্রী-বুদ্ধিতে চলেন না। তাঁর মনে হল, থানা-পুলিশ করাব আগে অন্যভাবে একটু চেষ্টা করা উচিত। তাই তিনি একদিন সন্ধেবেলা কেশব মিত্রের ভবানীপুরের বাড়িতে হানা দিলেন।

কেশব মিত্র তাঁকে যথোচিত আপ্যায়ন করলেও সব শুনে কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বিশ্বেশ্বরবাবুকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। উনি যে আপনাব সহোদর ভাই একথাটা আপনার অনেক আগেই আমাকে বলা উচিত ছিল। একজন পাগল, একজন বিধবা আর একটা বাচ্চা ছেলেকে তাড়ানোর ব্যাপারে যদি আপনাকে সাহায্য কবি তাহলে গাঁয়ে আমার বদনাম রটে যাবে। মানুষ নিয়ে আমার কারবার। ও আমি পারব না।

কিন্তু এ যে জবরদস্তি, জুলুম!

কেশব মিত্র খুব সহৃদয় ভাবে বললেন, জুলুম বলে ভাবছেন কেন? আপনার বাড়ি সারা বছর তো ফাঁকাই পড়ে থাকে। ওরা একখানা ঘর নিয়ে আছে থাক না। ছেলেটাকে আমি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। দেখা যাক যদি মানুষ হতে পারে।

একথায় সর্বেশ্বর মনে মনে আরো চটলেন। তাঁর ভয়ও বাড়ল। বললেন, এভাবে যদি দখলি স্বত্ব চলে আসে?

তাই কি আসতে পারে? যদি আসেও তখন মামলা করবেন, আমরা ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবো।

আপনি কি জানেন আমার ভাইয়ের ব্যবহারে আমার স্ত্রীর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল! মরেই যেতেন।

সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেছে। কিন্তু পাগলের কথায় কী যায় আসে বলুন!

শুধু কি কথা! আমার ভাই একটা কুড়ুল নিয়ে আমাদের কাটতে

এসেছিল। তার বিস্তর সাক্ষী আছে। আপনি জেনে রাখুন আমার ভাই কস্মিনকালেও পাগল ছিল না। আমাদের ওপর ওরকম হামলা করার পর বদনাম আর পুলিশের ভয়ে পাগল সাজছে। আসলে পাগল ও নয়।

কেশব মিত্র একটু ভাবনায় পড়লেন। সর্বেশ্বরকে চটিয়ে তাঁর লাভ নেই। প্রতি বছর সর্বেশ্বর পার্টি ফাণ্ডে টাকা দেন। গ্রামের স্কুল, লাইব্রেরি ও ক্লাবেও বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। এগুলো যে এক ধরনের ঘুষ তা কেশব ভালই জানেন। তবে এধরনের ঘুষ খেতেই হয় এবং যে ঘুষ দেয় তাকে খাতির না করেও উপায় নেই। একটি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও কেশব নিজের সিদ্ধান্তে যথেষ্ট অটল থাকতে পারছিলেন না। একটু নরম গলায় কেশব বললেন, বিশুবাবু যে ভায়োলেণ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা শুনেছি। আপনি তবু পুলিশে না গিয়ে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ কেস অনায়াসে হতে পারত।

সর্বেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনারা যদি এর বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেন তো খুব ভাল। নইলে আমি ও বাড়ি জমি সব বিক্রি করে দেবো বলে ঠিক করেছি। বুঝতে পারছি ওখানে শেষ অবধি থাকা যাবে না।

কেশব মিত্র একটু হাসলেন। বললেন, অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি যখন বলেছি, দেখব, তখন ঠিকই দেখব। পরশু রবিবার। ওইদিন আমি গাঁয়ে যাচ্ছি। আপনিও আসুন। একটা ফয়সালা করে দেওয়ার চেষ্টা করব।

কিন্তু ফয়সালা যাঁর সঙ্গে তিনি এখন যাবতীয় ঐহিক হিসাব-নিকাশের বাইরে ভিন্নতর এক উচ্চতায় বাস করছেন। গায়ে তুলোর কম্বল, পরনে ফেরতা দেওয়া এক শতচ্ছিন্ন ধুতি, গালে বিজবিজে দাড়ি, লম্বা নখের কোণে নীল ময়লা। এই পৃথিবীর মশা, পিঁপড়ে, কুকুর তাঁকে কামড়ায়, মাছি শোষণ করে ক্ষত, তিনি ততটা টের পান না।

প্রথম যেদিন তাঁকে বাজারের কাছে একটা কুকুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করল সেদিন তিনি খুবই চিৎকার করেছিলেন বটে। কিন্তু সেই চিৎকার ততটা ভয়ের নয়, যতটা বিস্ময়ের। এখন পৃথিবীকে নতুন রকম করে তাঁকে চিনতে হচ্ছে। বাজারের এক মিষ্টির দোকানী তাঁকে দয়াপরবশ একখানা বাসি জিলিপি খাইয়েছিল। দোকানের বাইরে পাতা বেনচে বসে জিলিপিটা খেয়ে তিনি এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করলেন। এরকম সম্পূর্ণ আনন্দ তিনি জীবনে কদাচিৎ পেয়েছেন। মানুষের কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়; তার কারণ নানা স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের ভাবনা সেই আনন্দের সঙ্গে রাহুর মতো

লেগে থাকে। সব মানুষই তো স্মৃতিতাড়িত এবং প্রবৃত্তিচালিত। শুধু পাগলেরা ততটা নয়। বিশ্বেশ্বরের অসংলগ্ন স্মৃতি তেমন তাড়না করে না তাঁকে, ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁর ঘুচে গেছে। তাই আজকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দকেও তিনি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেন।

জিলিপিটা খাওয়ার পর যখন পাটা বেনচ থেকে নামিয়েছেন তখন পা পড়ল এক হ্যাংলা কুকুরের লেজে। ঘেঁউ করে উঠে সেটা তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বরের বাঁ পা কামড়ে ধরল। চিৎকার দিয়ে বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে নিজের পাটা তুলে দেখছিলেন। গভীর ক্ষত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। এটা কী হল ? ভাল হল, না মন্দ ?

যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বিনোদবালা তাঁর অবস্থা দেখে চিৎকার করে ওঠায় বিশ্বেশ্বর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না না, একটা পা ঠিক আছে। এ পা-টায় কিছু হয়নি।

বস্তুত তাঁর মনে হয়েছিল, একটা পা অক্ষত থাকাটাই মস্ত লাভ।

বাঁ পায়ের সেই ক্ষতের কোনো চিকিৎসা হয়নি। কানাই ঝাড়ুনীকে ডেকে আনায় সে কিছু তুকতাক করে দিয়ে গেছে। বুড়ো হোমিওপ্যাথ বিনয়ভূষণ কয়েকটা পুরিয়া দিয়েছেন। ব্যস। সেই ক্ষত এখন পেকে দুনিয়ে উঠেছে। ভন ভন করে মাছি ওড়ে সেখানে। বিশ্বেশ্বরের হাঁটতে কষ্ট হয়।

তবু যে নতুন জগতের সন্ধান বিশ্বেশ্বর পেয়েছেন তার সন্ধানে রোজ ভোর না হতেই তিনি নেংচে নেংচে বেরিয়ে পড়েন। এ জগতে আকাশ মাটি গাছপালা, মানুষের বসত সবই আছে। কিন্তু কেমনই যেন সবকিছুই একাকার। এদের বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা সত্তাকে তিনি বোধ করতে পারেন না। এদের পারস্পরিক যোগসূত্রটিও নেই। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় তাঁর আবছা মনে পড়ে, বহুকাল আগে কিছু মানুষ তাঁকে সহবৎ শিখিয়েছিল। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা চিনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের সামনে এই পেচ্ছাপ করাটা ভাল না মন্দ তা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে কেউ গালাগাল দিলে বা মারতে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ পশুবৎ সংস্কারবশে পালিয়ে যান। বুঝতে পারেন কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু এই উপলব্ধি বেশীক্ষণ থাকে না। এক ঘণ্টা বাদেই হয়তো আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে ফেলেন। তাঁর নতুন জগতে স্মৃতির কোনো ভাব নেই।

আজ শীতের সকালে বিশ্বেশ্বর হাই স্কুলের পিছনে একটা ঢিবি আবিষ্কার করলেন। কতগুলো সবজে-সাদা কাঁটা গাছে আচ্ছন্ন এই ঢিবিটায় উঠতে

উঠতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা পাহাড় নাকি রে ? এটা কি পাহাড ?

কাকে জিজ্ঞাসা করলেন তা তিনিও জানেন না। কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রশ্নের জবাব ঠিকই পেয়ে যান। কেউ অলক্ষ্যে থেকে জবাব দেয়। হ্যাঁ, এটা পাহাড়। তুমি পাহাড়ে ওঠো।

বিশ্বেশ্বর ঢিবিটায় উঠে রাজার মতো কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে তাকালেন। বহু দূর বিস্তৃত নিজের রাজ্যপাট দেখে খুশিই হলেন তিনি। তুলোর কম্বলটায় নাক ঝাড়লেন। হঠাৎ বহুকাল আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটা কথা তাঁর মনে এল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফীখান নিল...আরে গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফীখান নিল...

এ এক গেঁয়ো বউমানুষের কথা। কোন বাটপাড় কুলগুরু কানে মন্ত্র দেওয়ার ছলে কান থেকে মাকড়ি খুলে নিয়েছিল। সেই বৃত্তান্ত। কথাটা মনে আসার কোনো কারণ নেই। তবু বিশ্বেশ্বর কথাটা দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। যেন এটাই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরী বার্তা। সকলের শোনা উচিত।

কিন্তু মুস্কিল স্কুলের ছেলেগুলোকে নিয়ে। ওই তারা আসছে। বিশ্বেশ্বর খুবই বিপন্নভাবে টালুমালু করে চারদিকে তাকাতে থাকেন।

এই পাগলা ! এই পাগলা ! এই পাগলা ! এই হালার পুত ! ছেলেগুলো চেঁচাতে থাকে।

নিরস্ত বিশ্বেশ্বর একটা ঢেলা কুড়িয়ে নেন। কিন্তু সেটা ছুঁড়বার আগেই একটা সাহসী ছেলে এগিয়ে এসে তাঁর গা থেকে কম্বলটা টেনে খুলে নিয়ে যায়।

এই হালার পুত ! এই কুত্তার বাচ্চা ! এই শুয়োবের—বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বিশ্বেশ্বর তার পিছু নিয়ে ঢিবি থেকে নামতে থাকেন। কিন্তু ব্যথায় অবশ বাঁ পায়ের জন্য পেরে ওঠেন না। ছেলেটা কম্বলখানা খোলা মাঠের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায়।

বিশ্বেশ্বর ক্ষুদে শয়তানগুলোর দিকে চেয়ে একটা চেনা মুখ দেখতে পান। ছেলেটা মাধু না ! মাধুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিসের তা তাঁর ভাল মনে পড়ে না। তবে ছেলেটাকে তাঁর খুব চেনা লাগে।

মাধব বাবাকে দেখছিল। করুণ মুখ, ছলছলে চোখ। বাবার ওই অপমানটা তার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। এতগুলো ছেলের সঙ্গে সে তো পারবে না। সে গিয়ে কম্বলটা কুড়িয়ে নিঃশব্দে বাবার

হাতে দিয়ে বলে, বাড়ি যাও না বাবা!

বাড়ি যাবো? কেন?

যাও। নাহলে এরা তোমার পিছনে লাগবে। এদিকে আর এসো না।

কোনদিকে যাবো?

বাড়ি! বাড়ি! বাড়ি চেনো না? মাধব রেগে গিয়ে বলে।

কার বাড়ি?

আমাদের বাড়ি।

আমাদের বাড়ি? আচ্ছা যাই।

এইমতো দিন কাটে বিশ্বেশ্বরের। খুব খারাপ কাটে না।

একটা পুরোনো ছেঁড়া পাটির ওপর চট ও কাঁথা কানি পেতে বিনোদবালা তাঁর জন্য মাটির ওপর যে বিছানাটা করে দেয় সেটায় সহজে শুতে চান না বিশ্বেশ্বর। শোওয়া আর স্নান করা তাঁর কাছে বড় কষ্টকর। শুলে দুনিয়ার অনেক মজা মাঠে মারা যায়। স্নান করতে গেলে দম বন্ধ লাগে, গা জ্বালা করে।

স্নানের সময় বিশ্বেশ্বর বড় গণ্ডগোল করেন বলে সেই সময়টায় কানাই এসে ধরে। বিনয় ডাক্তার বলেছে, কুকুরের কামড়ের জায়গাটা রোজ ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে দিতে। কানাই একটু ফিনাইল জোগাড় করেছে। রোজ ক্ষতস্থানটা স্নানের আগে ফিনাইল দিয়ে ধোয় সে। বিশ্বেশ্বর "বাবা রে! গেলাম রে! মেরে ফেলল রে!" বলে ষাঁড়ের মতো চেঁচান। কানাই চিৎকারে কান না দিয়ে ক্ষতটা মন দিয়ে দেখে আর আপন মনে বলে, বিষটা এখনো রয়েছে। হুঁ। ফুলেছে কতটা! পচ পচ করছে পুঁজে। একটু রক্তশোষণ করতে পারলে হত। তা ইনি কি আর তা করতে দেবেন!

বিনোদবালা বলেন, কানাই, তুমি বাবা আর জন্মে আমার ছেলে ছিলে। তুমি না থাকলে কী যে হত!

কানাই ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে বলে, ছেলে তো ছিলাম মাঠাকরুন, কিন্তু বাবু এসে ছেলেগিরি বের করবে। শুনছি রবিবার আসছে। কেশববাবুকে ধরে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না এবার।

বিনোদবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্তিমিত কণ্ঠে বলেন, বউ কেমন আছে খবর পেয়েছো?

ভালই আছে। নিজের ভাবনা ভাবো, তেনাদের কথা না ভাবলেও চলবে।

দুপুরে বিনোদবালা বিশ্বেশ্বরকে জোর করে শুইয়ে রাখেন। ব্রহ্মতালুতে

ঝাড়ুনীর দেওয়া একটা পুলটিশ লাগিয়ে দেন। শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকেন বিশ্বেশ্বর, ওরে বাবা রে ! এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! ওঃ ! এঃ ! ইঃ !

কে যেন চুপিসাড়ে ডাকে, বাবা !

বিশ্বেশ্বর চোখ চেয়ে ঘুলঘুলির মতো জানালায় সেই ছেলেটাকে দেখতে পান। ছেলেটা তাঁর কে যেন হয় !

কে রে ?

ও বাবা, আমলকী খাবে ?

বিশ্বেশ্বর উঠে পড়েন, আছে নাকি ? চল যাই। তুই ছেলেটা বড় ভাল।

মাধব বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে বেরোয়। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাবা, শোনো, আর কখনো স্কুলের কাছে যাবে না।

কোন্ স্কুলের কাছে ?

যেখানে আজ গিয়েছিলে।

যাবো না ? আচ্ছা। কী খাওয়াবি বললি যে।

চলো। বাগানে ওই দিকটায় একটা গাছ আছে। মেলা আমলকী।

স্কুল মাধবের ভাল লাগে না। টিফিনে সে পালায়। আজ পালিয়েছে অন্য কারণে। স্কুলের একটা ছেলে তাকে বলেছে, রবিবাব তোর জ্যাঠামশাই আসছে। শুনেছিস ? তোদের গাঁ থেকে তাড়াবে। সালিশী বসছে।

সেই থেকে মাধব ভয় খাচ্ছে। এরকম একটা ভয় তার ছিল। তাড়ালে আবার পথ। আবার ভিক্ষে।

সে বলল, বাবা, জ্যাঠামশাই আসছে।

জ্যাঠামশাই ? ভাল।

আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

তাই নাকি ? ভাল।

কোথায় যাবো তাহলে আমরা ?

সে যাবোখন।

কোথায় ? আমাদের তো থাকার জায়গা নেই।

নেই ! বলে কি রে !

বিশ্বেশ্বর প্রসঙ্গটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন না, কিন্তু একটা আন্দাজ পান। কী যেন ঘটেছিল। খুব ভয়ংকর এক ঘটনা। স্মৃতি টলোমলো করতে থাকে।

মাধব গাছে উঠে আমলকী পাড়ে। বিশ্বেশ্বর কুড়িয়ে একটি মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করেন। বড্ড টক আর কষায়। কিন্তু ফেলেন না। খেতে থাকেন।

সর্বেশ্বর রবিবার দুপুরে যখন এসে পৌঁছোলো তখন কেশব মিত্রের নাটমন্দিরে জোর সালিশী চলছে। প্রায় সকলেই সর্বেশ্বরের পক্ষে। কেশব মিত্রের বডিগার্ড সেই মস্তান মতো লোকটিব নাম রতন অধিকারী। সে পরিষ্কার বলে দিল, সর্বেশ্বরবাবু শত হলেও স্থানীয় লোক। বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁর ভাই হলেও উটকো লোক। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। এঁর জন্য সর্বেশ্বরবাবু গাঁ ছাড়লে গাঁয়েরই বদনাম। তাছাড়া রিফিউজিদের জন্য কলোনী রয়েছে। সেখানে বিশ্বেশ্বরবাবুব যাতে জায়গা হয তা কেশববাবু দেখবেন।

অগত্যা সেই সিদ্ধান্তই হল। সহজ সরল ও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত।

সাত : বিশ্বেশ্বরের মাথায় চকিত বিদ্যুতের খেলা এবং দুটি অপমৃত্যু

মিটিং শেয হতে দুপুর শেষ হতে চলল। সর্বেশ্বর দুপুরে কেশব মিত্রের বাড়িতেই খেয়ে একটু গড়িয়ে নিলেন। তারপর রতন অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বেশ্বরকে গ্রাম-প্রধানদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে রওনা হলেন।

রতন অধিকারীকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ হল, রতন বর্ধমান শহরের কুখ্যাত গুণ্ডা। সর্বত্রই সে ছায়ার মতো কেশব মিত্রকে অনুসরণ করে। অসম্ভব সাহসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতিব এই লোকটি যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে।

কিন্তু সেদিন সর্বেশ্বরের মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর বার বারই কিছু পুরোনো কথা মনে পড়ছিল। তাঁরা তিন ভাই। হরিহরাত্মা না হলেও তিন ভাইয়ে কোনোদিন বনিবনার অভাব হয়নি। পিঠোপিঠি ভাই বলে একটু ঝগড়াঝাঁটি হত ঠিকই, কিন্তু এক সঙ্গে বেড়ে ওঠার দরুন তিন ভাইয়ের মধ্যে এক ধরনের বিরল বন্ধুত্বও ছিল। বজ্রযোগিনী গ্রামের মাঠ ঘাট পুকুর সর্বত্রই তাঁরা তিনজন বহু স্মৃতি ফেলে এসেছেন। কিন্তু একটা কথা সর্বেশ্বর খুব ছোটো থাকতেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় এবং ছোটোজন বাস্তববুদ্ধি বর্জিত। বড় জনের যেমন ছিল হিপনোটিজমের শখ, ছোটোজনের তেমনই ছিল সংগীতের প্রতি টান। কোনোটাই সংসারী এবং বিষয়ীর কোনো কাজে লাগে না। তবু বাল্যকালে তিনি তাঁর এই দুই বাস্তববুদ্ধিহীন সহোদরকে ভালবাসতেন।

সেই ভালবাসার কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই সর্বেশ্বর খুব আই-ঢাই বোধ করছিলেন।

রতন অধিকারী মন্ত্রবৎ একটু প্রাপ্তিযোগের আশা করছিল। তাই সে সর্বেশ্বরকে একটু ভেজানোব জন্য বলল, আপনার এই ভাইটি কোথা থেকে এল বলুন তো!

সর্বেশ্বর অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রশ্নটা শুনে আচমকা জবাব দিলেন, কেন, মায়েব পেট থেকে।

কিম্ভূত উত্তর। বতন একটু হেসে বলল, সে তো জানি। কিন্তু এতদিন ছিল কোথায়? পাকিস্তানে নাকি?

হ্যাঁ। দেশেব বাড়িতে।

কিছু মনে কববেন না মশাই, বাঙালরা একটু খচ্চর হয়। আপনার এই ভাইটি কিন্তু একটি তে-এঁটে খচ্চব। পরিণামও তেমনি। কুকুরে কামড়ে একেবারে ফালা ফালা করেছে।

ঘটনাটা সর্বেশ্বর শুনেছেন কিন্তু খুশি হননি। তার মনে হচ্ছিল, ওরা বড় কষ্ট পেয়েছে। একটা শ্বাস ছেড়ে সর্বেশ্বর বললেন, খচ্চর তো বটেই।

উনি কি বরাবরই এবকম ভায়োলেন্ট টাইপের?

না, তা ঠিক নয। বরং উল্টোটাই ছিল। কেন যে সেদিন মাথায দুষ্টবুদ্ধি চাগাড় দিল।

তাড়িযে দিন মশাই, তাড়িয়ে দিন। এসব লোক গাঁয়েব পক্ষে বিপজ্জনক। কখন কাকে কুপিয়ে বসে, কাব মাথা ফাটায় তার ঠিক কি?

সর্বেশ্বব তাড়াতেই যাচ্ছেন। তাই বললেন, আপনিও একটু সাহায্য করবেন। করলে আজই ঘটিবাটি যা আছে সব সমেত বের করে দেবো।

এ কথায় রতন একটু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, সাহায্য মানে! কেশবদা তো আমাকে বলেই দিয়েছে, একদম তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবি।

কিন্তু ঠিক যেরকম সহজে কার্যোদ্ধার হবে বলে ভেবেছিলেন তাঁরা ততটা সহজ হয়নি।

রতন আব সর্বেশ্বব যখন এদের উচ্ছেদ কবতে যাচ্ছেন তখন বিশ্বেশ্বর তাঁর বিছানায় চুপ করে বসেছিলেন। পায়ের ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড টাটানির চোটে বিশ্বেশ্বর স্থির থাকতে পারছিলেন না। বড্ড উৎপাত করছে মাছিরা। ভ্যান ভ্যান করে সারাক্ষণ পায়ের চারপাবে ঘুরছে, উঠছে, বসছে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে। "যাঃ যাঃ" বলে মাছি তাড়াতে তাড়াতে জ্বালাতন হয়ে বিশ্বেশ্বর উঠে বসে চাবধারে তাকালেন। ঘরের অন্য ধারে আর একখানা চাটাইয়ের ওপব শতেক ন্যাকড়া জোড়া দেওয়া একটা চাদরের মতো

জিনিসের ওপর পড়ে ঘুমোচ্ছে বিনোদবালা আর মাধব।

বিশ্বেশ্বর দেখেশুনে বুঝতে পারলেন, এরা বড় গরিব। তাই ভারি রাগ করে বললেন, ধুস শালা।

একটা খুব বড় বাড়ির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। চারদিকে অনেকখানি জমি ঘিরে উঁচু পাঁচিল, সেখানে মেলা লোক। অঢেল টাকা। তারপর কী যেন হল। খুব গোলমাল বেধে গেল চারদিকে। একটা লোক যেন কোথায় গিয়েছিল, সে আর ফিরল না। আর একটা লোক যেন কোথায় পালাল, তারপর সেই বিশাল বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর টাকা পয়সা পাওয়া যেত না।

বিশ্বেশ্বর খুব কষ্টে উঠলেন এবং দাওয়ায় এসে চুপ করে বসে রইলেন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বড় ঠাণ্ডা। বিশ্বেশ্বর তুলোর কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলেন। চোখটা বুজে আসছে ক্লান্তিতে। তাঁর গানের কথা মনে পড়ছে, ভারি সুন্দর সব সুর ছিল। কোথায় গেল। বিশ্বেশ্বর চোখ বুজে হঠাৎ আজ একটু গুনগুন করে উঠলেন। শব্দটা বেশ লাগল তাঁর। কোথা থেকে আসে শব্দটা! বাঃ বেশ তো! ফের একটু গুনগুন করলেন, তারপর মৃদু স্বরে গাইতে লাগলেন। বিস্মৃতপ্রায় কথা, ভুলে যাওয়া সুরের বেশ তাঁকে আন্দোলিত করছিল। পায়ের টাটানিটা কিছু কম বোধ করলেন তিনি।

হঠাৎ দুটো লোক উঠোনে এসে দাঁড়াল। বিশ্বেশ্বর একটু জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন লোক দুটোর দিকে। এদের মধ্যে একটা লোককে তিনি চেনেন। খুব চেনা লোক। লোকটাকে দেখেই বিশ্বেশ্বরের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। ভয়ও পেলেন। আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলেন তিনি।

রতন এগিয়ে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে ক্রূর দৃষ্টি। বলল, এই যে বিশ্বেশ্বরবাবু, পাগলামির খেলা আর কতদিন চলবে?

বিশ্বেশ্বর জানেন তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর। তাই লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন। কী বলতে হবে তা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। আজকাল তাঁর একটা মুস্কিল হয়েছে। মনে অনেক কথা আসে, কিন্তু মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরোয়। যা বলতে চান তা কিছুতেই বলে উঠতে পারেন না। এর জন্য বড় কষ্ট হয় তাঁর।

লোকটাকে বিশ্বেশ্বরের খুব ভয় করতে লাগল। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, গুইজ্যাতি গুইজ্যাতি কইরা ঠেকচাফীখান নিল...

ওসব ন্যাকা-বোকা সেজে আর লাভ নেই, বুঝলেন। এই কানাই!

কানাই !

কানাই তার ঘরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ডাক শুনে বেরিয়ে এসে খুব অমায়িক হেসে বলল, রতনদা যে ! ওঃ, বাবুও এসে গেছেন।

রতন বলল, এদেব সব ঝাটিপাটি সমেত এখান থেকে বার করতে হবে। তৈরি থাকিস।

আজই নাকি ?

আজই এখুনি। আমি গিয়ে গদাইয়ের গরুর গাড়িটা পাঠিয়ে দেবো। তুলে নিয়ে বর্ধমানে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

বিশ্বেশ্বর একটু নড়েচড়ে বসলেন। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখে তাঁর যেন কী একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না।

সর্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করছিলেন। বয়সে বিশ্বেশ্বর তাঁর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো। কিন্তু চেহারাটা ভারী বুড়িয়ে গেছে। কাঁচা পাকা চুল আর দাড়িতে মুখটা প্রায় ঢাকা। শরীরও ঝটকে গেছে অনেক। চোখে অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা। বাঁ পা ফুলে ঢোল হয়ে আছে, ক্ষতস্থান থেকে রস গড়াচ্ছে। মাছি উড়ছে। সহোদরের এই করুণ অবস্থা দেখে তাঁর বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস ঘনিয়ে উঠল। একবার তাঁর ইচ্ছে হল বলেন, থাক, ওরা এখানেই থাক। অনেক কষ্ট পেয়েছে। আহা।

কিন্তু বললেন না।

রতন খুব হম্বিতম্বি করছিল, কী মশাই, আজও একটু গা-জোয়ারি দেখাবেন নাকি ? আমার নাম রতন অধিকারী, বুঝলেন ? স্রেফ কেটে দামোদরে ভাসিয়ে দেবো !

চেঁচামেচিতে বিনোদবালা আর মাধব উঠে পড়েছে। রতনের রুদ্রমূর্তি দেখে বিনোদবালা এসে তাড়াতাড়ি বিশ্বেশ্বরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, ওর শরীর ভাল না। মাথাটাও খারাপ হয়েছে। ওকে কিছু বলবেন না। আমরা চলে যাবো।

মাথা খারাপ না হাতি। ওসব ঢের দেখা আছে। আপনারা সব কাঁথাতানি যা আছে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আর ও মশাই বিশ্বেশ্বরবাবু, আজ আর কুড়ুল-ফুড়ুল দেখাবেন না। এসব আমার ঢের দেখা আছে। অন্য জায়গায় গিয়ে বীরত্ব ফলাবেন, এখানে নয়।

বিশ্বেশ্বরের মাথায় আচমকাই বিদ্যুৎ খেলে গেল। কুড়ুল ! কুড়ুল। তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারলেন, দ্বিতীয় লোকটা তাঁর দাদা সর্বেশ্বর। হাড়ে

হারামজাদা লোকটা তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে। তাঁকে উচ্ছেদ করে ভয় দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তায় ভরা দুনিয়ায় ছেড়ে দিতে চাইছে। এই শালা...এই শয়তান...বিশ্বেশ্বরের চোখের সামনে একটা ঝকঝকে কুড়ুল যেন নাচতে লাগল।

মাথায় উপর্যুপরি বজ্রপাত ঘটে গেল বিশ্বেশ্বরের। এক ধূসর মলিন অতীতের গর্ভ থেকে প্রেতের দীর্ঘ হাতের মতো বহু গ্লানি ও অপমান এসে তাঁকে স্পর্শ করছিল। সেইসব হাত তার শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতি মুচড়ে দিচ্ছে, খুবলাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাথার ভিতরে প্রচণ্ড শব্দে কী যেন ফাটছে। চোখের সামনে বিদ্যুতের নীল শিখা, ঝলসে উঠছে বারবার।

রোগা ও জীর্ণ শরীর থেকে তুলোর কম্বলটা ফেলে বিশ্বেশ্বর হঠাৎ এক আদিম মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালেন। খোঁড়া পায়ের ব্যথা তিনি একটুও টের পেলেন না। তাঁর মুখ থেকে শুধু একটা শব্দ ছিটকে বেরোলো, কুত্তার বাচ্চা!

দুর্ভাগ্যবশে কানাইয়ের সেই কুড়ুলটা তার দাওয়ায় সযত্নে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। সকালেই কানাই কাঠ কেটেছে। বিশ্বেশ্বর এক লাফে উঠোনে নেমে দূরত্বটুকু চোখের পলকে অতিক্রম করলেন। কুড়ুলটা তুলে নিলেন সিদ্ধ হাতে। যেন এই অস্ত্র তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন পৃথিবীর যাবতীয় বিপথগামী ক্ষত্রিয়দের নিধন করতে।

একজন রোগজীর্ণ পাগলের যে এত দ্রুতগামী হাত পা থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি রতন। বিশ্বেশ্বর যখন তীব্র কুঠার মাথার ওপর তুলে এক হা-হা শব্দে বাতাস প্রকম্পিত করে উঠোনে লাফিয়ে নামলেন তখন রতন নিতান্ত অভ্যাস ও সংস্কারবশে আত্মরক্ষার তাগিদে "ওরে বাবা!" বলে একটা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে সরে গেল তাঁর পথ থেকে।

নিরস্ত্র ও প্রতিরোধহীন সর্বেশ্বর ভাল করে ঘটনাটি বুঝতেই পারেন নি। আকস্মিকতায় হাঁ করে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বিশ্বেশ্বর রতনকেই মারতে চাইছে।

গায়ে যতখানি শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু বিশ্বেশ্বর সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর কুড়ুলে। উজ্জ্বল ইস্পাতের ফলাটা রোদে ঝিকিয়ে উঠে আকাশ থেকে দুরন্ত আক্রোশে নেমে এল।

সর্বেশ্বর একটা জান্তব শব্দ করলেন মাত্র। কুড়ুল তাঁর মাথাটাকে প্রায় দু ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল। ছিটকে উঠল রক্ত ও ঘিলু। মাটিতে পড়ে সর্বেশ্বর বারকয়েক বলির পাঁঠার মতো টানা মারলেন।

বিশ্বেশ্বর থামলেন না। কুড়ুলটা তুলে আবার এবং আবার এবং আবার গেঁথে দিতে লাগলেন সর্বেশ্বরের শরীরে।

বিনোদবালা মূর্ছা গেলেন। রতন অধিকারী উঠোনের এককোণে প্রকাণ্ড এক শিশুর মতো হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে গুঁড়ি মেরে বসে মুখখানা বিস্ময়ে তোম্বা করে দৃশ্যটা দেখছিল। কানাই কাঠ হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে। কানাইয়ের বউ এক ভাষাহীন আর্ত আঁ-আঁ চিৎকারে ভরে দিচ্ছিল চারদিক।

মাধব এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিল চোখের পাতা একবারও না ফেলে। সম্ভবত সে শ্বাসও নেয়নি। ভাঙা একটা পুতুলের মতো তার জ্যাঠামশাই পড়ে আছেন উঠোনে। শিশির আলতা যেন গড়িয়ে যাচ্ছে চারধারে। কুড়ুলের একটা ধক ধক শব্দ যেন পৃথিবীর গভীর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে কিনা তা সে অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না। তার হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

বিশ্বেশ্বর চেঁচাচ্ছিলেন, আরো খাবি? আরো খাবি?... আরো খাবি?

তাঁর কণ্ঠস্বরে এক ভয়াবহ আক্রোশ ও ক্রোধ থাকায় বড় বিকট শোনাচ্ছিল সেই চিৎকার। তবে ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছিল বিশ্বেশ্বরের গলা। বড় বড় শ্বাস পড়ছিল। রক্ত ঘিলু ও হাড়ের টুকরো ছিট্‌কে পড়েছে চারধারে। একটা আস্ত মানুষের সযত্নে লালিত শরীর কতই না ঠুনকো!

বিশ্বেশ্বর কুড়ুলটা ফেলে ধীরে ধীরে একটু নেংচে দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। হাতে পায়ে রক্তের ছিটে। চোখের চাউনি কিছু ঘোলাটে। হাঁফাচ্ছিলেন। তুলোর কম্বলটা একটু ঝেড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলেন। অস্ফুট স্বরে বার বার বলছিলেন, আরো খাবি? যাঃ, খাওয়া শেষ! খাওয়া একদম শেষ!

গ্রামশুদ্ধ লোক যখন ভেঙে পড়ল উঠোনে বিশ্বেশ্বর তখনো খুব নির্বিকার ছিলেন। পুলিশ যখন তাঁকে নিয়ে যায় তখনো তাঁর মুখে কৃতকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি।

এরপর তিনদিন ধরে মাধব এমন একটা ঘোরের মধ্যে রইল যে, নিজের চারপাশটা ভালভাবে অনুভবই করতে পারেনি। কেমন যেন ছায়াবাজীর মতো সব লোকজন আসছে যাচ্ছে, দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিনোদবালার বিলাপ ও কান্না বা কানাই ও তার বউয়ের "হায় হায়" শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মাধবের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয়নি। তিনদিন সে এক আচ্ছন্নতার মধ্যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় আলো-আঁধারির মধ্যে কাটাল। নিজের চোখে সে যা দেখেছে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তার

বাবা—নিরীহ, নির্বোধ, পাগল বাবা এ কাজ করল কী করে ?

বিশ্বেশ্বরের অবশ্য বিচারে ফাঁসী বা যাবজ্জীবন হয়নি। আদালতকে সাজা দেওয়ার সময়ও দেননি বিশ্বেশ্বর। থানার লক-আপেই তাঁর জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পুলিশ সবে কেস তৈরি করতে শুরু করেছিল। মামলা উঠবে। বিশ্বেশ্বরকে সেই সময়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। শেষ দিকটায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মৃত্যু এসে সেই যন্ত্রণায় প্রলেপ দিয়ে গেল।

বাপকে মাধব কোনোদিনই বাপ হিসেবে ভালবাসেনি। সে সুযোগ সে পায়নি কখনো। বিশ্বেশ্বর বাবার মতো আচরণ করতেন না তো। দায়িত্বও কিছু পালন করেননি। কিন্তু দীর্ঘকাল একসঙ্গে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে তারা বেঁচে ছিল। পাগল, উপার্জনে অক্ষম, ভীতু এই মানুষটির প্রতি আর একজন মানুষ হিসেবেই একটা টান ও মায়া জন্মেছিল। এইমাত্র। সুতরাং বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুতে সে তেমন শোক পেল না। খুব বিশাল কোনো অভাবও বোধ করল না।

বিশ্বেশ্বর সারা জীবনে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর এই শেষ কাজটি খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে সর্বেশ্বরের পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রামের বাড়ির দখল নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি। এমন কি কেউ আসতও না। ধীরে ধীরে জ্যাঠামশাইয়ের এই অনেকটা জমি সমেত বাড়িখানা মাধবদের বাড়িই হয়ে যাচ্ছিল। পুরোটা মাধবদের নয় অবশ্য। কানাইয়েরও দখল আছে।

বিশ্বেশ্বর মারা যাওয়ার পর কানাই একদিন বিনোদবালাকে বলল, মা-ঠাকরুণ, এ তো দোষের বাড়ি হয়ে গেল। বাবুর আত্মা এ বাড়িতে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, টের পাও ?

বিনোদবালা মাথা নেড়ে বলেন, পাই বাবা। সবসময়ে পাই। সবু, বিশু দুজনকেই টের পাই। দেখিও ওদের। কাল রাতেও তো বিশু এসে শিয়রে বসে ঘ্যান ঘ্যান করছিল, ও দিদি, চান করব না। ভাত দাও।

কানাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, বড় ভাল ছিল লোকটা। কেন যে অমন ক্ষেপে গেল। তা দোষের বাড়ি হয়ে একরকম ভালই হয়েছে। সহজে কেউ কিনতে চাইবে না।

কেউ কিনতে চাইছে নাকি ?

তা নয়। তবে বাবুর বউ আর ছেলেরা বাড়ি জমি বেচার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তাহলে কী হবে ?

ভাবছো কেন ? গাঁয়ের বাড়ির খদ্দের তো আর শহর থেকে আসবে না। গাঁয়ের লোকেই কিনবে। তারা কেউ কিনতে চাইছে না। তবে বাড়ি বিক্রি না হোক চাষের জমি কিনে নেবে লোকে।

বিনোদবালা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন।

ইঁটের পাঁজার গায়ে শ্যাওলা পড়ল। বালির স্তূপ আর পাথরকুচি মিশে যেতে লাগল মাটির সঙ্গে। ঘরে রাখা সিমেণ্টের বস্তায় সিমেণ্ট জমাট বেঁধে গেল। সবই ঘটল খুব আস্তে আস্তে, দীর্ঘ সময় ধরে। সেই সময়ের প্রবহমানতায় মাধবের পৃথিবীও বদলায় একটু একটু করে।

একদিন এক ঘনঘোর বর্ষার দিনে স্কুলে যাচ্ছিল মাধব। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। এক হাতে বই অন্য হাতে হাওয়াই চটি নিয়ে জল ভাঙছিল মাধব। মাঠের মধ্যিখানে সেই ঢিবিটা জলের ওপর জেগে আছে। একধরনের কাঁটা গাছে আচ্ছন্ন।

মাধব থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। চেয়ে রইল। ওইখানে তার বাবা বিশ্বেশ্বর এসে বসতেন। ছেলেরা বড় খ্যাপাতো, যন্ত্রণা দিত। ঢিবিটার দিকে চেয়ে মাধবের চোখে জল এল না। বুকে মোচড়ও দিল না। চারদিকে নিমগ্ন মাঠের মধ্যে ওই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ঢিবিটা দেখে তাব মনে হচ্ছিল, মাথাটা একটু ওপরে তোলা থাকলে লোকে দেখতে পায়। চারদিকেই দুঃখের জল। তাতে ডুবে থাকার কোনো মানেই হয় না।

অনেকক্ষণ মাধব ঢিবিটার দিকে চেয়ে রইল। বেশী উঁচু নয়, তবু জলের ওপর জেগে থাকার মতো উঁচু। এই একটুখানি উচ্চতা বড় দরকার।

সর্বেশ্বর খুন হওয়ার পর এই গাঁয়ে তারা প্রায় একঘরে। কেউ তাদের বাড়িতে আসে না, তারাও যায় না কারো বাড়ি। পাগল এবং খুনী বিশ্বেশ্বরের ছেলে বলে তার বদনাম। বহুকাল কেশব মিত্রের বাড়ি যায় না সে। চিতু আর চিমটিকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। তাদের মাঝখানে এক ধূসর ব্যবধান আজ।

মাধব স্কুলবাড়ির দালানে এসে ওঠে। ছেলেরা আজ বিশেষ কেউ আসেনি। মাস্টারমশাইদের মধ্যেও অনেকে অনুপস্থিত। ক্লাসঘরগুলো ফাঁকা।

মাধব তার ক্লাসঘরে গিয়ে নিজের জায়গাটিতে বসল। ভেজা জামা-প্যাণ্ট গায়ে শুকোচ্ছে। মাথা থেকে জল পড়ছে টপটপ করে। শীত করছে একটু একটু। তবু সে জানে তার জ্বর হবে না। তার শরীর অত ঠুনকো নয়। অনেক জলঝড় সে পেরিয়ে এসেছে।

স্কুল বসবার ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং। আজ ছাড়াছাড়ি নেই। পাঁচ সাতটি ছেলে কাকভেজা হয়ে জড়োসড়ো শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অন্ধকার ক্লাসঘরে। মাধবও বসে থাকে। তার সঙ্গে কেউই প্রায় কথা বলে না। সে একটু আলগা, একটু আলাদা। চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে ছিল মাধব। আকাশ আরো কালো হয়ে এল। বৃষ্টি নামল চেপে। ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, গল্প করছে। তার সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই।

মাস্টারমশাই রোল কল করছেন। মাধবের নাম সবার শেষে। সে সাড়া দেয়। তারপর ফের বসে থাকে চুপচাপ। বসে বসে সে ঢিবিটার কথা ভাবে।

স্কুল সেকেণ্ড পিরিয়ড পর্যন্ত চলে কোনোক্রমে। তারপর ছুটির ঘণ্টা বাজে। চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে যায় প্রকাণ্ড স্কুলবাড়ি।

শুধু মাধব বসে থাকে একা তার ক্লাসঘরে। ঘোর অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ঘরখানা ভুতুড়ে হয়ে যেতে থাকে। মাধব জানে তার কোথাও যাওয়ার নেই। কোথাও ফেরার নেই। বসে বসে সে শুধু ঢিবিটার কথা ভাবে।

কতক্ষণ বসে ছিল মাধব তা তার খেয়ালও ছিল না। যখন বিকেলে এক অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, চারদিক ঘুটঘুট্টি হয়ে উঠল তখন মাধব ধীর পায়ে বেরিয়ে এল স্কুল থেকে।

রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। মাধব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সন্ধ্যার একটু রেশ তখনো ঘন মেঘের আড়াল থেকে ফিকে একটা আভা ছড়াচ্ছিল। সেই রহস্যময় আলো-আঁধারিতে চারদিকে এক গভীরতা তৈরি হয়েছে। এক বিষণ্ণতার মায়াজাল।

মাধব জলের মধ্যেই দাঁড়ায়। ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দুবেলা ভাল করে ভাত জোটে না। পরনে একটার বেশি দুটো জামা বা প্যান্ট নেই। মাটির ঘরে এই বর্ষায় সাপ চলেফিরে বেড়ায়, নটনট করে ঘোরে বিছে। এইসব মেনে নিয়ে সে বেঁচে আছে। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কত আশা আকাঙ্ক্ষাই যে সর্বদা টগবগ করে ফোটে!

ঊর্ধ্বমুখ মাধবের গালে চোখে কপালে খরশান বৃষ্টির ফোঁটা এসে বিদ্ধ করে। কোন দূর আকাশ থেকে কোন স্বর্গ থেকে আসে জল! তাকে নিষিক্ত করে দেয়। বইখাতা ভেজে। জামাকাপড় ভিজতে থাকে।

জল ভেঙে মাধব হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, এই যে বেঁচে থাকা এরকম বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না।

কিন্তু এমন একদিন হবেই, সে বাড়ি ফিরে দেখতে পাবে, তার হারানো দাদু ফিরে এসেছেন। বাক্স ভর্তি টাকা, নাতির জন্য জামাকাপড়, আরো কত কী! কিংবা বড় জ্যাঠাই হয়তো এসেছেন। তাকে আর পিসিকে নিয়ে যাবেন লণ্ডনে।

কিছুই বলা যায় না তো। মাধব বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।